জলপ্লাবন

নবীনের-সংসার, মানস-সরোবর, মানস কুঞ্জ, গার্হস্থ্য ও
সন্ন্যাস, কুম্ভকর্ণী নিদ্রা, শুভকর্ম্মে গদ্যপদ্য,
Rambling Thoughts প্রভৃতি

রচয়িতা

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি

প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

Published by
J. N. Bose
29, Durgacharan Mitter Street,
CALCUTTA.

বৈশাখ ১৩২৩।

Printed by—
KULA CHANDRA DEY,
Sastra Prachar Press,
5, Chidammudi Lane, Calcutta.

উপহার

শ্রী

জলপ্লাবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্রকিশোর দত্ত, কায়স্থ—ভারি ধনবান্ ব্যক্তি—জমিদার। বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর, এখনও অবিবাহিত। চরিত্রবান্, আচারবান্ রমেন্দ্রকিশোরের সংসারে এক বৃদ্ধা পিসিমাতা ভিন্ন রমেন্দ্রকে শাসিত করিবার আর কেহ বড় ছিল না। কিন্তু পিসিমাতার কঠিন শাসন, পরে অনুনয়, অনুরোধেও রমেন্দ্র-কিশোর বিবাহ করিল না। পিসিমাতা তাহাকে বিবাহের কথা বলিলে সে মাত্র হাসিতে থাকে। অনুরোধের প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে পারিলে সে কোন না কোন সূত্রে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। বাটীর পুরাতন খাতাঞ্জি মনোহর দাস পিসিমাতার উকীল হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই এক কথা বলিত। সেই কারণে রমেন্দ্রকিশোর মনোহর দাসকেও একটু দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। সে কথা বুঝিতে পারিয়া মনোহর দাস রমেন্দ্রকে বিলক্ষণ চাপিয়া ধরিত, কিন্তু ফলে তাহার কিছুই হইত না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া রমেন্দ্রের পিসিমাতা শিবসুন্দরী অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন। রমেন্দ্রকিশোর শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরের শেষে পিতৃহীন। পিসিমাতার স্নেহাদরেই রমেন্দ্র-কিশোর লালিত পালিত। তেমন ক্ষেত্রে শিবসুন্দরী রমেন্দ্রকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে স্থির হইতে পারেন কি ?

কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন? বিবাহের কথা উঠিলেই রমেন্দ্র আর তাঁহার নিকটে পর্য্যন্ত আসে না। এক আহারের সময় ভিন্ন রমেন্দ্র আর বাটীর মধ্যে বড় প্রবেশ করে না। আহারের সময়ে শিবসুন্দরী কেমন করিয়াই বা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করেন! রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসিমাতাকে বিলক্ষণ চিনিত, তাঁহার স্বভাব সে বিলক্ষণ অবগত ছিল। সেই কারণেই সে বাটীর মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থাটা এইরূপ ভাবে করিয়া রাখিয়াছে।

বিবাহ না করিবার যে কারণটা কি, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া রমেন্দ্রকিশোর কাহাকেও বলে নাই, অথবা বলিতে চাহে নাই। রমেন্দ্রকিশোরের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সত্যব্রত রায় সেই কথা তুলিয়া বন্ধুকে একদিন বিলক্ষণ চাপিয়া ধরিল এবং কেন যে তাহার বিবাহে এরূপ বীতরাগ তাহার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বহু তর্ক-বিতর্ক সাধ্য-সাধনার পরে রমেন্দ্রকিশোর সাশ্রুনয়নে কহিল—অতি অল্পবয়সে

যে পিতৃ-মাতৃহীন, সংসার-বন্ধন যা'র আদৌ নাই, তা'র আবার সংসার-ধর্ম্ম কি ভাই? আমি ভাগ্যহীন, আবার একটা পরের মেয়েকে ভাগ্যহীনা কেন করি বল? যে ক'টা দিন থাকি, সে ক'টা দিন পরের সেবাই আমার ধর্ম্ম হ'ক। এর অধিক আমার আর কিছুর আবশ্যকতা নাই।

রমেন্দ্রের কথা শুনিয়া সত্যব্রত নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতে-ছিল। কিন্তু তাহার মনোভাব সে বন্ধুকে জানিতে দেয় নাই—পাছে তাহাতে রমেন্দ্রকিশোর উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার মত-টাকে অভ্রান্ত মনে করে। সত্যব্রত বরং রমেন্দ্রের তর্ক-যুক্তিতে নিতান্ত ঔদাসাগ্য প্রকাশ করিল এবং তাহার তর্কযুক্তি যে নিতান্ত ভিত্তিহীন সে কথা স্পষ্ট বলিতেও ক্রুটি করিল না। তর্কের উপরে সত্যব্রত অধিকতর তর্ক করিল, সমধিক যুক্তি প্রদর্শন করিল। তর্ক-যুক্তি, অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ, ভয়প্রদর্শন ও বহু সাধ্যসাধনাতেও সত্যব্রত রমেন্দ্রকে বিবাহ-মতাবলম্বী করিতে পারিল না। তাহার সেই এক কথা—কথান্তর নাই। সত্যব্রত ক্ষুণ্ণ হইল,—নিরাশ হইয়া নিরস্ত হইল। কিন্তু শিবসুন্দরী রমেন্দ্রের যুক্তিতর্কে কর্ণপাতও করিলেন না। ব্যাকুলা শিবসুন্দরীর "জিদ" বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঘটক ডাকাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য একটী সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য তিনি ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের কথা ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল।

সে সকল কথা জানিতে পারিয়া রমেন্দ্রকিশোর একদিন ঘটককে পথিমধ্যে "পাকড়াও" করিয়া বিলক্ষণ ধম্‌কাইয়া দিল। কিন্তু বাটীর গৃহিণী যখন ঘটকরাজের সহায়, তখন রমেন্দ্রের রোষ-কষায়িত লোচন দেখিয়া সে ভয় পাইবে কেন? ঘটকপ্রবর হাসিতে হাসিতে বলিল—

"বাবু, এখন অমন ক'র্‌ছেন, কিন্তু বিবাহের পর আমাকে ডেকে মাসহারা দিতে হ'বে—হাঁ—সেকথাও আমি ব'লে রাখ্‌ছি; আমি অমন ঢের দেখেছি বাবু—ঢের দেখেছি। বাবুরা সব বিবাহের পূর্ব্বে একবার তড়পান; তা'রপর একেবারে গঙ্গাজল।"

অপ্রতিভ হইয়া রমেন্দ্রকিশোর ঘটকরাজকে নিষ্কৃতি প্রদান করিল। সেই অবধি ঘটকঠাকুরের ঘট্‌কালির ঘটাটা অপ্রতিহতভাবেই চলিতে লাগিল! রমেন্দ্রকিশোর দেখিয়া শুনিয়াও সে সম্বন্ধে আর কোন কথাই কহিত না। ঘটকঠাকুরের বিদ্রূপ কৌতুকে সে কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাত্রীপক্ষের সহিত যখনই একপ্রকার স্থির হইতে লাগিল, রমেন্দ্রকিশোর তখনই এমন কৌশল করিয়া পাত্রীপক্ষের নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিল যে, পাত্রী-পক্ষ সে বিবাহ-প্রস্তাবে আর কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারিল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। কিন্তু রমেন্দ্রের সে চাতুরী সে কৌশল আর অধিক দিন চলিল না। চতুর ঘটক, রমেন্দ্রের চাতুরী অবশেষে ধরিয়া ফেলিল। শিবসুন্দরী একদিন শুনিলেন,

রমেন্দ্র নাকি কোনও এক পাত্রীপক্ষের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছে,—তাহার রাজযক্ষা আছে, রাত্রে অল্প অল্প জ্বর হয়, কাসিও আছে—তেমন পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে কন্যার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। কথাটা শুনিয়া রমেন্দ্রকিশোরের জননী-স্বরূপিণী শিবসুন্দরী দারুণ বেদনানুভব করিলেন। বেদনার তীব্রতায় তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রমেন্দ্রকে ডাকাইয়া তিনি একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন—

"হ্যাঁরে রমি, এই বয়সে এই জ্বলুনী সহ্য কর্‌বার জন্য কি আমায় বাঁচ্‌তে হ'ল? আমার পেটের একটা নাই যে, তা'র মুখ চেয়ে আমি বেঁচে থাকি। দাদা তোকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন—তা'কি এই জ্বলুনী সহ্য কর্‌বার জন্য?"

শিবসুন্দরী স্নেহাধিক্যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন একভাবে, রমেন্দ্রকিশোর কিন্তু বুঝিল অন্যভাবে। ইতঃপূর্ব্বে রমেন্দ্রকিশোরের একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল—এক্ষণে তাহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। রমেন্দ্রকিশোর একটু বিরক্তভাবে বলিল—

"ও সকল কথায় তুমি থাক কেন পিসিমা? কথায় না থাক্‌লে ত আর জ্বালাতন হ'তে হয় না।"

কথা সাঙ্গ করিয়া রমেন্দ্রকিশোর বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার নয়নে সহস্রধারা বহিতে

লাগিল। শিবসুন্দরীর রোদন—অভিমানের। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—রমি ত কখনও আমার এরূপ কঠিন কথা বলে নাই, এরূপ আচরণ ত কখনও আমার সহিত করে নাই! আজ করিল কেন?

এই ঘটনার দুইদিবস পূর্ব্বে শিবসুন্দরী তাঁহার দেবর-পুত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। অন্য সময় হইলে তিনি হয়ত নিমন্ত্রণ-রক্ষায় তেমন মনোযোগিনী হইতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিমানের বশেই হউক, কিম্বা রমেন্দ্রকিশোরকে একটু শাসন করিবার জন্যই হউক, নিমন্ত্রণ-রক্ষায় তিনি শূন্যপ্রাণে, শূন্যহৃদয়ে স্বর্গগত স্বামি-গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উৎসব-বাটী হইতে দাসী ভৃত্যাদি আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমভি-ব্যাহারে বর্দ্ধমানে—দেবরগৃহে যাত্রা করিলেন। রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসিমাতার সঙ্গে মনোহর দাসকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল! শিবসুন্দরী কহিলেন—"আবশ্যক কি, সঙ্গেত লোক যথেষ্ট আছে।"

ইহাও শিবসুন্দরীর অভিমানের কথা। রমেন্দ্রকিশোর কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিল না। যাত্রাকালে শিবসুন্দরী রমেন্দ্রকে বলিয়া গেলেন—

"আসবার সময় ফরমাস্ দিয়ে মিহিদানা সীতাভোগ আনব।"

সুতরাং রমেন্দ্র কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, তাহার পিসিমাতা ক্রোধ অথবা অভিমানভরে বর্দ্ধমানে যাইতেছেন; শিবসুন্দরীর মনের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। তিনি ভাবিলেন—কৈ, রমিত তাঁহার বর্দ্ধমান-যাত্রায় কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না। তবে কি রমি এখন আর তাঁহাকে তেমন ভালবাসে না, তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে না।

"না" কথাটা ভাবিতে শিবসুন্দরীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অন্তরে অন্তরে ফুলিয়া ফুলিয়া তিনি রমেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-গ্রহণকালে তাঁহার চক্ষু অবশ্য অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। রমেন্দ্র তাহাতে ভাবিল—এ অশ্রুধারা মায়ার; স্নেহের পাত্রের নিকট বিদায়-গ্রহণকালে কাহার চক্ষু আর নিরশ্রু থাকে?

রমেন্দ্র কিন্তু সে অশ্রুজল দেখিয়াও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না! সে ভাবিল, তাহার উৎকণ্ঠা তাহার চাঞ্চল্য, তাহার অশ্রুজল দেখিয়া তাহার পিসিমাতা যদি অধিকতর উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়েন। তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

রমেন্দ্রের ঔদাসীন্য, রমেন্দ্রের প্রাণ-হীনতার ভাব দেখিয়া শিবসুন্দরী কিন্তু দারুণ মর্ম্মাহতা হইলেন। তিনি ত রমেন্দ্র-কিশোরের মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাহাতেই তাঁহার মনে অশান্তি-ঝটিকা বহিতে লাগিল। সংসারে এইরূপই

হয়। একের মনোভাব অন্যের সহজে অবগত হইবার উপায় নাই বলিয়া সংসারে এত জ্বালা, এত বেদনা, এত নির্দ্দয়তা।

স্নেহময়ী শিবসুন্দরী সমস্ত পথটা নীরব ক্রন্দনে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। তখনও তিনি প্রকৃতিস্থা হইতে পারেন নাই

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা তখন প্রায় দশটা—রমেন্দ্রকিশোর একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় পড়িয়া তাহার অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছে, আর সেই সঙ্গে তাহার করুণাময়ী পিসিমাতার বর্দ্ধমানযাত্রা উপলক্ষে একটা দারুণ অভাব অনুভব করিতেছে, একটা অব্যক্ত বেদনায়, ব্যাকুলতায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে সত্যব্রত রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে ডাকিল—"রমেন্।"

সত্যব্রতের আহ্বানে বিচলিত রমেন্দ্রকিশোর আরাম-কেদারা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যব্রত পুনরায় কাতরভাবে ডাকিল—"রমেন্।"

আহ্বানের প্রত্যুত্তর না দিয়াই রমেন্দ্র দ্বিতল হইতে বহির্ব্বাটীতে দ্রুতবেগে আসিয়া পৌঁছিল। সত্যব্রত তখন অর্দ্ধমৃতাবস্থায় একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িয়াছে। রমেন্দ্রকে দেখিবামাত্র সত্যব্রত সাশ্রুনয়নে কহিল—

"রমেন্, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুমি শীঘ্র এস।"

বিস্মিত রমেন্দ্র ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে—কি ?"

সত্যব্রত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—

"তুমি শীঘ্র জামাটা গায়ে দিয়ে এস; কিম্বা তা'র চেয়ে জামাটা কা'কেও আন্‌তে বল। তুমি আর উপরে উ'ঠ না—তা' হ'লে বড় বিলম্ব হ'বে।"

রমেন্দ্রের ভৃত্য একটা আধ ময়লা জামা আনিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। রমেন্দ্রকিশোরের চরণে চটী জুতা ছিল; সে সেই অবস্থায় অঙ্গরাখাটী স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল—

"চল তবে।"

"যাই"—বলিয়া সত্যব্রত পাগলের মত উদাস-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। সত্যব্রতের সে দৃষ্টি রমেন্দ্রকিশোর তেমন লক্ষ্য করে নাই। রমেন্দ্র আবার বলিল,—"চল।"

সত্যব্রত উন্মাদের মত বলিতে লাগিল—"নাঃ—আর যা'ব না, গিয়ে আর কি ক'র্‌ব! সে হয়ত স্রোতের টানে এতক্ষণ কতদূর ভেসে চ'লে গেছে। বুঝেছ রমেন্, বুঝেছ? তুমি বরং যাও. দেখ যদি কিছু ক'র্‌তে পার।"

দারুণ উৎকণ্ঠায় রমেন্দ্র সত্যব্রতের দক্ষিণহস্তখানি আপনার দুই করে ধারণ করিয়া কহিল—

"কি হয়েছে বল না সতু!" সত্যব্রত একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—

সে সকালে আজ গঙ্গাস্নান কর্‌তে গিয়েছিল। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরাও তা'র সঙ্গে ছিল। স্নান কর্‌তে গিয়ে সেই কেবল জলে ডুবে গেছে।

উৎকণ্ঠিত রমেন্দ্রকিশোর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কে, কে সেতু!"

সত্যব্রত উন্মত্ত-উদাস ভাবে কহিল—

"আহা—পাঁচু, পাঁচু হে, আমার পাঁচু। কি হ'বে ভাই রমেন্, কি হ'বে! সে যে পরের ছেলে—তার বাপের কাছে কি জবাব দেব। বল—রমেন্, কি হ'বে বল না ভাই!

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রমেন্দ্র কেবল মাত্র বলিল—"এস।"

"এস" বলিয়াই সে দ্রুতবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সত্যব্রত পুত্তলিকাবৎ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী অনতিদূরেই দণ্ডায়মান ছিল। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। শকটচালক অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে যথাশক্তি দ্রুতবেগে শকট চালাইতে লাগিল।

পাঁচুগোপাল সত্যব্রতের ভাগিনেয়। শৈশবেই সে মাতৃহীন। তাহার পিতা ব্রজেশ্বর, পাঁচুগোপালকে পাঁচুগোপালের মাতুলালয়ে রাখাই অত্যুত্তম বিধান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটু কারণও ছিল।

ব্রজেশ্বরের দুই বিবাহ। পাঁচুগোপাল, ব্রজেশ্বরের কনিষ্ঠা পত্নীর একমাত্র পুত্র। পাঁচুগোপালের মাতা মৃতা। এক্ষণে

ব্রজেশ্বরের সংসারে এমন কোন স্ত্রীলোক নাই, যাহার দ্বারা পাঁচুগোপাল লালিত পালিত হইতে পারে। ব্রজেশ্বর অবশ্য অবস্থাপন্ন লোক! ইচ্ছা করিলে তিনি দাসদাসীগণের উপরে শিশু পালনের ভারার্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্রজেশ্বরের শ্বশুরদেব ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী বর্ত্তমান থাকিতে দেড় বৎসরের শিশু পাঁচু-গোপালকে দাসদাসীগণের দয়ার উপর রাখা হইবে কেন? ব্রজেশ্বর শিশুকে শিশুর মাতুলালয়েই পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থলেই শিশু চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঁচুগোপালের বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন তাহার মাতামহ ভবধাম ত্যাগ করিলেন। তখন হইতে পাঁচুগোপালের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সত্যব্রতের উপর পড়িল। সত্যব্রত ভাগিনেয়কে পুত্রস্নেহে লালন পালন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিত—আপন পুত্রাপেক্ষাও সে পাঁচুগোপালকে অধিকতর স্নেহ করিত। সেই পাঁচুগোপাল ষোড়শবৎসরে পদার্পণ করিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। সত্যব্রত আর কেমন করিয়া স্থির থাকিবে?

শোকাচ্ছন্ন সত্যব্রত গাড়ীর মধ্যে করুণ বিলাপ করিতে লাগিল। কখনও বা পাঁচুগোপালকে লক্ষ্য করিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—"পাঁচু তুই আয় বাবা! তুই না খেলে আমি খাই কেমন ক'রে—বাঁচি কেমন্ ক'রে?"

রমেন্দ্র বুঝিল, সহানুভূতি দেখাইলে সত্যব্রতের শোক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, শোকের প্রাবল্যে সে আরও নানা

উৎপাত আরম্ভ করিবে। নয়নবারি রুদ্ধ করিয়া রমেন্দ্র সত্য-ব্রতকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—

"তুমি কি হে—আগের কাজ আগে কর; তা'রপর না হয় শোকের অভিনয় কর।"

বন্ধুর সহানুভূতিসূচক ভর্ৎসনায় সত্যব্রত কতকটা শান্ত হইয়া বসিল। শকট তখন গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছে।

জলপুলীশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নৌকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া রমেন্দ্র ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ব্রজেশ্বর ও সত্যব্রতের আত্মীয়গণ তখন গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছে। সকলেই শোকে মুহ্যমান। ব্রজেশ্বর কেবল অটল অচল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রৌঢ় ব্রজেশ্বর তখন স্থির অবিকম্পিত চিত্তে গুরুদেবকে স্মরণ করিতেছে। আর জলমগ্ন আত্মজের উদ্দেশে ইষ্টদেবতার স্তব করিতেছে। গঙ্গাতীর তখন লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের চিত্তস্থৈর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

জলপুলীশ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও জলমগ্ন পাঁচু-গোপালের কোন সন্ধান করিতে পারিল না। সকলেই বলিতে লাগিল—"জোয়ারের স্রোতে সে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে?" ভগ্নহৃদয়ে সকলেই বাটী প্রত্যাগমন করিল। সত্যব্রত প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর জীবনে গঙ্গাজল স্পর্শ করিবে না, গঙ্গাস্নান করিবে না, গঙ্গা-মাহাত্ম্য স্বীকার করিবে না।

বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদির পর রমেন্দ্র ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

“প্রতিবৎসরই গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া অনেক বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী জলমগ্ন হয় বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বাবুঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বেই এইরূপ দুর্ঘটনা প্রতি-নিয়তই ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করি-য়াছি। এই ঘাটের অনতিদূরে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে বলিয়া অনে-কের বিশ্বাস। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকটে আমাদের এই নিবেদন, যেন সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। কলিকাতার বক্ষের উপর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটা নিতান্তই যে ক্ষোভের বিষয়, সে বিষয়ে, আর সন্দেহ নাই। অনুসন্ধানের ফলে ইহা যদি স্থিরীকৃত হয় যে, ঐ স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে, তাহা হইলে তাহার আশু প্রতীকার একান্ত প্রার্থনীয়।

আর একটা কথা—ডিভন্সিয়ার প্রভৃতি স্থানে জলমগ্নদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে, সেরূপ প্রথা কি কলিকাতাতেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না? চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আমরা যদি সেইরূপ ভাবে তরী, লোকজন, জাল প্রভৃতির বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে ত অনায়াসেই আমরা অনেক জলমগ্নকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারি। বংশ-দুলাল ভবিষ্যতের আশাস্থল এই সোণার চাঁদ ছেলেগুলা যদি

এমন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, দেশ অতি ভাগ্যহীন। কত প্রকারে না কত লোক কত চাঁদা দিয়া বৃথা যশ, বৃথা সম্মান অর্জ্জন করিতে যত্নবান! আর কলিকাতার ধনকুবেরগণ কি এত বড় একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কার্পণ্য করিবেন? লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা, গভীর পরিতাপের বিষয়।"

প্রবন্ধ প্রেরণান্তে রমেন্দ্র সত্যব্রতের সংবাদ লইবার জন্য সত্যব্রতের বাটী গমন করিল। বন্ধু, বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, সত্যব্রতের গৃহে যে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহার মধ্যে অনেক দ্রব্যের সহিত পাঁচুগোপালের স্মৃতি বিজড়িত। সত্যব্রতকে সে স্থানে রাখা রমেন্দ্র আর উচিত বিবেচনা করিল না। সে তাহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। সত্যব্রত তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমেন্দ্র স্থির করিল, তাহাকে আপাততঃ কোন তীর্থ-স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে অনেকটা কাজ হইতে পারে; সত্যব্রতের আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই উপায়ই প্রশস্ত উপায় বলিয়া রমেন্দ্র স্থির করিল। সত্যব্রতও সে প্রস্তাবে সম্মত হইল।

দুই চারি দিবসের মধ্যেই বৈদ্যনাথ যাওয়ার দিন ধার্য্য হইয়া গেল। রমেন্দ্র সঙ্গে যাইবে। রমেন্দ্র সঙ্গে না থাকিলে সত্যব্রতকে শান্ত করিবে কে?

রমেন্দ্রও ভাবিল—"মন্দ কি! পিসিমার জন্য মনটা বড় খারাপ হ'য়ে আছে। যাই, না হয় দিন কত ঘুরে আসি। নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে পিসিমা'র ফি'র্তেও ত এখনও দশ পনের দিন।"

বাটীর ব্যবস্থাদি করিয়া, বিষয়কর্ম্মাদি সম্বন্ধে মনোহর দাসকে যথাবিধি উপদেশ দান করিয়া রমেন্দ্র সত্যব্রতের সঙ্গে বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল। তাহার প্রবন্ধের কি ফলাফল হয়, তাহা জানাইবার ভার রমেন্দ্র এক বন্ধুর উপর অর্পণ করিয়া গেল এবং মনোহর দাসকে সে বিষয়ে তদ্বির করিতে বলিল। চাঁদাস্বরূপ রমেন্দ্রকিশোর দুই সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। প্রবন্ধের কিন্তু কোনও ফলই ফলে নাই। প্রবন্ধ পাঠান্তে পাঠকবর্গ কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল! কেহ কেহ বা এমনও বলিল—"ইহা উন্মাদের প্রলাপ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে আসিয়া পর্য্যন্ত রমেন্দ্রের কোনও চিঠি পত্র পান নাই। তাঁহার অভিমানের মাত্রা তাহাতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তিনিও আর রমেন্দ্রকে কোনও চিঠি পত্র লিখিলেন না।

রমেন্দ্র ভাবিল—পিসীমাতা বহুকাল পরে তাঁহার আপন বাটীতে গিয়াছেন, বহু আত্মীয় কুটুম্বগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তিনি বোধ হয় চিঠি পত্র লিখিবার অবসর, সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন নাই। কেবলমাত্র পৌছান সংবাদটুকু দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। শিবসুন্দরী ভাবিলেন—রমেন্দ্র এখন তাঁহাকে গ্রাহ্যমাত্র করে না। সেই কারণে সে পত্রাদি দ্বারাও তাঁহার সংবাদ রাখাও আর উচিত বিবেচনা করে না।

সত্যব্রতকে লইয়া রমেন্দ্র যে এখন কিরূপ বিব্রত, সে সংবাদ শিবসুন্দরী জ্ঞাত ছিলেন না। সে সংবাদ শুনিলে শিবসুন্দরীর অভিমানানলে হয়ত এরূপ ঘৃতাহুতি পড়িত না। ঘটনাচক্রে কিন্তু সকলই বিপরীত হইল। শিবসুন্দরীর অভিমানের আর সীমা রহিল না। শিবসুন্দরীকে পত্র লেখা রমেন্দ্রের অবশ্য খুব উচিত ছিল। কিন্তু নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে ও গ্রহবৈগুণ্যে পত্র লেখাটা আর রমেন্দ্রের ঘটিয়া উঠিল না। শিবসুন্দরীর সেইটাই অভিমানের বিশেষ কারণ।

অন্নপ্রাশন উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবার পর নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণ আপনাপন গৃহে ফিরিয়া গেল, কিন্তু শিবসুন্দরী সে কথার উল্লেখ মাত্রও করিলেন না। বাটীর অন্যান্য সকলে ভাবিল, বহুকাল পরে তিনি দেশে আসিয়াছেন, দেশটা হয়ত তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, সেইজন্যই বোধ হয় তিনি কিছুকাল দেশে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহা ত সুখেরই কথা, সুতরাং সে বিষয়ে আর কেহ কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। বিশেষ, শিবসুন্দরীর দেবর অহিশেখরের আদেশে সে সম্বন্ধে কেহ কোনও কথাই কহিতে সাহস করিল না।

অহিশেখর ভ্রাতৃজায়ার উপর সন্তুষ্ট নহে। তাহার কারণ, নগদ টাকাকড়ি ও অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া শিবসুন্দরী এখন পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। সে সমস্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদি শিবসুন্দীর মৃত্যুর পর যে রমেন্দ্রকিশোরেরই হস্তগত হইবে, তাহা বুঝিতে আর অহিশেখরের বাকী ছিল না। কিন্তু ভ্রাতৃজায়া অর্থশালিনী। তাঁহার স্ত্রী-ধনের উপর অহিশেখরের কোনও দাবী দাওয়া ছিল না। সুতরাং মুখ ফুটিয়া সে আর শিবসুন্দরীকে কোনও কথা বলিতে পারিত না।

সেই অহিশেখর যখন দেখিল, শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে বসবাস করিবারই অভিপ্রায় করিতেছেন, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ভগবান বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাই তাহার দেবী তুল্যা ভ্রাতৃজায়া আর পাপিষ্ঠ

রমেন্দ্রকিশোরের সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন না। ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি অহিশেখরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কুটীল কুটজাল বিস্তার করিতে লাগিল। তাহাতেও কিন্তু রমেন্দ্র-কিশোরের প্রতি শিবসুন্দরীর স্নেহ ভালবাসা শিথিলতা প্রাপ্ত হইল না। শিবসুন্দরী অবশ্য মিষ্টভাষী দেবরের মনের কথাটা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। তাহা বুঝিলে হয়ত তিনি সেই মুহূর্ত্তেই রমেন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেন। কিন্তু অহিশেখর সে সকল বিষয়ে খুব সংযতবাক্। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, চালচলন দেখিয়া সহসা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, সে কিরূপ প্রকৃতির লোক। সে যাহা হউক, এইরূপে তিন চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তখনও শিবসুন্দরীর কলি-কাতায় ফিরিবার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। অহিশেখর ভগবানকে আবার ধন্যবাদ প্রদান করিল।

শিবসুন্দরীর মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি অনেক সময়ে অনেকের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না—শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকেন। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—শরীরটা তাঁহার ভাল নহে। তাই শয্যাত্যাগ করিতে তাঁহার আর বড় ইচ্ছা হয় না।

অহিশেখর যখন বারম্বার শুনিল যে ভ্রাতৃজায়ার শরীরটা ভাল নহে, তখন সে বৈদ্য ডাকাইল। বৈদ্য আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, রোগিণীর নাড়ী অতিশয়

দুর্ব্বলা এবং নাড়ীতে অহোরাত্র জ্বর থাকে ! জ্বরের তাপ অধিক নহে, তথাপি ইহাকে বিষমজ্বর বলিতে পারা যায়। বৈদ্য এমন কথাও বলিলেন যে, রোগিণীর ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ বয়সে সে রোগ হইলে তাহা আরোগ্য করা শিবের অসাধ্য হইবে।

চিকিৎসকের কথা শুনিয়া অহিশেখর একটু উদ্বিগ্ন হইল। এ উদ্বেগ, তাহার ভ্রাতৃজায়ার পীড়ার জন্য নহে, রোগিণীর অর্থ-গুলি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে। রোগিণী যদি সহসা মৃত্যু-মুখে পতিতা হয়, তাহা হইলে অহিশেখরের ভাগ্যে আর অর্থ প্রাপ্তির আশা থাকে না। শিবসুন্দরী ত অর্থাদি সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমানে আসেন নাই। তাঁহার অর্থ ও অলঙ্কারাদি রমেন্দ্র-কিশোরের নিকটেই ছিল। অহিশেখর ভাবিল, রমেন্দ্রকে কোনও প্রকারে বর্দ্ধমানে আনাইতে হইবে এবং তাহার সম্মুখে শিবসুন্দরীর দানপত্রের কথা তুলিতে হইবে।

যথোপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অহিশেখর রমেন্দ্র কিশোরকে সবিস্তারে পত্র লিখিল। কিন্তু রমেন্দ্র তখন কোথায়? মনোহরদাস সে কথা পত্রের দ্বারা অহিশেখরকে জানাইয়াছিল। সে কথা শ্রবণ করিয়া শিবসুন্দরী কহিলেন—"আহা থাক, বাছার শরীর খারাপ, সে দিন কতক বৈদ্যনাথেই থাকুক্। আমার ত তেমন কিছু হয় নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যব্রতকে লইয়া রমেন্দ্রকিশোর এখন বৈদ্যনাথ জংসনে অবস্থান করিতেছে। স্থান ও বায়ুপরিবর্ত্তনের গুণে সত্যব্রতের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদিও পাঁচুগোপালের শোক সত্যব্রত এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তথাপি তাহার শোকের মাত্রা যে বিলক্ষণ হ্রাস পাইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। রমেন্দ্রের সেবায় এবং দুই একজন সাধুসন্ন্যাসীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীতে শোকাচ্ছন্ন সত্যব্রতের শোকাপনোদন হইয়াছে! সে পুনরায় হাস্য-কোলাহলে যোগদান করে এবং গল্প গুজবের মজলিসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে।

সত্যব্রতের বাটী বৈদ্যনাথ জংসন ষ্টেসনের অনতিদূরে। স্থানটার নাম "জেসিডি"। যে স্থানে বন্ধুদ্বয় বাসা লইয়াছে, সে স্থান হইতে দেওঘর বা দেবঘর প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। বৈদ্যনাথ জংসন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত রেললাইন্ আছে। কিন্তু বন্ধুদ্বয় রেলগাড়ীতে না যাইয়া পদব্রজেই দেওঘরে যাতায়াত করে। গল্প কথায় পথ অতিবাহিত করিলে সে দুই-ক্রোশ পথ অল্পকালের মধ্যেই অতিক্রম করিতে পারা যায়। তাহাতে ভ্রমণেরও সুখ হয়, আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিবারও সুবিধা হয়। এই কারণেই বন্ধুদ্বয় বাষ্পীয় শকটে যাতায়াত করিতে আদৌ চাহে না।

বাসাবাটী একটী অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর। স্থানটী বেশ

নির্জ্জন, বেশ মনোরম। বাটীটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীর প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলস্থ গৃহে দুই একখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই এক স্থলে তিন চারি হস্ত উচ্চ এক আধটা প্রস্তর-স্তূপও দেখা যায়। অনেকের ধারণা সে বাটীতে সর্পাদির উৎপাত কিছু অধিক। সেই কারণে সে বাটীতে সহজে কেহ থাকিতে চাহে না! অন্য কোনও বাটীর সুবিধা করিতে না পারিয়া সেই বাটীখানি ভাড়া লইতেই রমেন্দ্রকিশোর বাধ্য হইয়াছিল। সর্পের উৎপাতের কথা লোকমুখে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত সে বাটীতে তাহার কিছুই দেখিতে পায় নাই। তাহাদের উৎকণ্ঠা দূর হইল, তাহারা বেশ নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে লাগিল। সর্পভয় ভীত বাটীর সত্ত্বাধিকারী অতি অল্পহারেই বাটীখানি ভাড়া দিয়াছিলেন। সেই সুবিধাটুকু লাভ করিয়া এবং স্থানটা ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া বন্ধুদ্বয় নির্দ্দিষ্ট সময়েরও অধিক কাল সে স্থানে বাস করিতে লাগিল। পিসীমাতার জন্য রমেন্দ্রের মধ্যে মধ্যে মন খারাপ হইত এবং একটা ব্যাকুলতা আসিত বটে, কিন্তু সত্যব্রত ঝটিতি তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিত।

"যাই যাই" করিয়া আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। এইবার রমেন্দ্র তাহার পিসীমাতার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল। "জেসিডি" তাহার আর ভাল লাগিল না। অথচ সত্যব্রতের

"রোগিণী মৃত্যুমুখে—শীঘ্র আসিবে—নতুবা আর দেখা হইবে না।"

আহারাদি সে দিবস আর কাহারও হইল না। বৈদ্যনাথের বাসা উঠাইয়া দিয়া বন্ধুদ্বয় বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশেষ তাড়াতাড়িতে দ্রব্যসম্ভার আর সঙ্গে লওয়া হইল না—দ্রব্যাদি হেপাজৎ করিয়া আনিবার ভার একজন ভৃত্যের উপর প্রদান করিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেণ তখন আসিয়া পড়িয়াছে। টিকিট কিনিবার আর সময় হইল না—গার্ডের অনুমতি লইয়া বন্ধুদ্বয় তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

রমেন্দ্র তখন বড়ই বিমর্ষ। গাড়ীর একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া সে কি একটা ভাবিতেছিল। সত্যব্রত তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও সে যখন তাহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইল না, তখন অধিক কথা কহিতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে আকাশে ঘনঘটা দেখা গিয়াছিল—এইবার বর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রবল ঝড়ের মুখে বৃষ্টিধারা গাড়ীর মধ্যে প্রস্রবণের সৃষ্টি করিল। তাহাতেও কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের সমাধি ভঙ্গ হইল না। বৃষ্টিধারায় রমেন্দ্রকে সিক্ত হইতে দেখিয়া সত্যব্রত রমেন্দ্রের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া কহিল—

ভাই, ভেবে আর ফল কি? ভগবানের মনে যা' আছে তাই হ'বে। বৃষ্টিতে তুমি ভিজ না ভাই। এখনও অনেকটা পথ—

আর্দ্র শরীরে, আর্দ্র বস্ত্রে অধিকক্ষণ থাক্‌লে অসুখ কর্‌তে পারে।”

উদাস দৃষ্টিতে রমেন্দ্রকিশোর কহিল—“আর অসুখ!”

কথাটা বলিবার সময় রমেন্দ্র একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। সত্যব্রত বন্ধুর মনোভাব বুঝিতে পারিল এবং সহানুভূতি প্রদর্শনে সে বিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু মেঘ গর্জ্জন, ঝটিকা স্বনন ও ট্রেণের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ—ত্রিশব্দ সংমিশ্রিত হইয়া তখন এক প্রলয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইল না। সত্যব্রত গাড়ীর সার্শি খড়খড়িগুলি তুলিয়া দিল।

আকাশে মেঘাড়ম্বর তখন খুব—দিবাভাগে তামস রজনীর ছায়া পড়িয়াছে। নিকটস্থ তরুলতা গুল্ম প্রভৃতি প্রলয়ান্ধকারের ছায়ায় মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি আর চলে না। শ্রাবণ মাসের বেলা—তখন প্রায় চারি ঘটিকা।

সেই অন্ধকার, সেই প্রবল ব্যাত্যা ভেদ করিয়া বাষ্পীয়-শকট আসুরিক-শক্তিতে আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে; প্রকৃতির ভীম ভীষণ বিপর্য্যয় দেখিয়া আরোহীবর্গ আতঙ্কিত হইল। উন্মাদিনী প্রকৃতি তখন অট্টহাস্যে দিকদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া, সে গর্জ্জন শুনিয়া কাহার হৃদয় আর অবিকম্পিত থাকিতে পারে?

ট্রেণ অতি দ্রুতবেগে চলিতেছিল—সহসা বজ্রপাত শব্দে একটা ভীষণ ধাক্কা খাইল। আরোহীবর্গের মানসিক অবস্থা

তখন যে কিরূপ, তাহা ভাষা প্রকাশ করিতে অক্ষম। ভয়ে কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ বা অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পলকে প্রলয়-কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সমস্ত ট্রেণখানা ইরম্মদ গতিতে একবার পিছাইয়া আবার সম্মুখে ছুটিয়া আর একটা প্রবলতর ধাক্কা খাইল। তাহাতে কাহারও মস্তক চূর্ণ হইল, কাহারও হস্ত পদ ভাঙ্গিল, কাহারও চক্ষু বিদ্ধ হইল; আর কেহ বা গড়াইয়া গড়াইয়া দৈবকৃপায় রক্ষা পাইল। গাড়ীর "ঝোলা আসনের" উপর আরোহীবৃন্দের যে সকল দ্রব্যাদি রক্ষিত ছিল, তাহা পড়িয়া যাওয়ায় অনেকেরই প্রাণঘাতক হইল।

ট্রেণ তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে—আর নড়ন্ চড়ন্ নাই। সকলে বুঝিল, ট্রেণের গতিরোধ হইয়াছে। তখন অনাহত যাত্রীগণের মধ্যে দুই একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া মুক্ত প্রান্তরে নামিয়া পড়িল। তাহাদের নামিতে দেখিয়া আরও দুই দশ জন নামিতে সাহস করিল। যাহারা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারাও এইবার দুই একজন করিয়া নামিতে লাগিল! আঘাত যাহাদের গুরুতর হইয়াছিল, তাহারাই কেবল অসহায় অবস্থায় শয়িত থাকিয়া করুণ বিলাপে ঘটনা স্থল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। জনকয়েক যাত্রী ভাগ্যদোষে ভব-লীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। তাহাদের আত্মীয়গণ উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি তখনও পড়িতেছে, ঝটিকা তখনও বহিতেছে, অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ঝঞ্ঝার বিক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া ভীত চকিত আরোহী সঙ্ঘ সেই জনহীন, বৃষ্টিঝটিকা বিক্ষুব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়া জল ভাঙ্গিয়া লক্ষ্যহীন পথে ছুটিতে লাগিল। অনেকের ধারণা ঘটনাস্থল নিরাপদ নহে।

তবে যাহারা সাহসী ও বিবেকী তাহারা পলাইল না। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সেই শ্রেণীর লোক। আর্ত্তের সেবায় তাহারা স্বার্থ-চিন্তা ভুলিয়া গেল, পরার্থে তাহারা সেবক সম্প্রদায় ভুক্ত হইল। হৃদয়বান সাহেব যাত্রীগণও স্বেচ্ছায় সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহেব ও ভারতীয় সেবকগণ একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরিত্রাণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন! সে কি মহান্ দৃশ্য!

সেবকগণ দেখিলেন, তাঁহাদের ট্রেণের এঞ্জিন ও তিনখানি গাড়ী মৃত ঐরাবতের মত লৌহ-বর্ত্মের এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। কাহারও বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে যাত্রী-ট্রেণের সহিত মালগাড়ীর সংঘর্ষ হইয়াছিল—তাহার ফলেই এই দুর্ঘটনা। যাত্রীট্রেণখানা মালগাড়ীর পশ্চাতে ধাক্কা মারিয়াছিল—তাহাতেই এই কাণ্ড। সম্মুখ সমর হইলে না জানি আরও কি হইত!

একটা ষ্টেশনের অনতিদূরেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সংঘর্ষের ভীষণ শব্দ শুনিয়া ষ্টেশনের লোকজন ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য ষ্টেশনেও তারের সংবাদে দুর্ঘটনার

কথা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। সকল স্থান হইতেই "সাহেব সুবা" ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ লোক-লস্কর সঙ্গে করিয়া আসিয়া পড়িলেন এবং অচিরে আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান হইলেন। ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন, যে সাহেব কর্ম্মচারীগণ যখন আর্ত্তসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট সাহেব।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। ট্রেণ সংঘর্ষে একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। একটু দুগ্ধের জন্য শিশুর তখন প্রাণ যায়। শিশুর দরিদ্র পিতা একজন স্বদেশবাসীর নিকট একটু দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়াও পান নাই। দরিদ্রের সম্বল মাত্র যে দশটী টাকা তাঁহার নিকট ছিল, সেই দশটী টাকা, দায়ীত্বহীন, অর্থলোলুপ স্বদেশবাসীর হস্তগত হইলে তবে তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক অর্দ্ধ পোয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধ ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন হীনবুদ্ধি লোকের জন্যই না গৌরব-স্মৃতি মণ্ডিত এদেশ লোক বিশেষের চক্ষে এত ঘৃণ্য!

যাত্রিগণকে লইয়া যাইবার জন্য অন্য একখানি ট্রেণ রাত্রি দশটার সময় ঘটনাস্থলের অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছিল। কর্দ্দমাক্ত হইয়া, জল ভাঙ্গিয়া যাত্রিগণ সেই ট্রেণে আসিয়া চড়িল।

রমেন্দ্রের বাম হস্তে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল—সত্যব্রত

আদৌ আহত হয় নাই। রমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—ভগবান্ তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় পিসীমাতা কি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না!

নিরাপদে বর্দ্ধমান পৌঁছাইবার জন্য বন্ধুদ্বয় ব্যাকুলপ্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সময়ে না পৌঁছাইলে পিসীমাতার সহিত যে আর তাহাদের দেখা হইবে না! সেই ভাবনায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল!

ট্রেণ হু হু শব্দে চলিতে লাগিল। তখনও ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রোগিণীর দেবর রোগিণীকে ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় সময়াতিপাত করিতেছেন—গৃহমধ্যে কি যেন কি একটা অলৌকিক অস্ফুট শব্দ হইল। চতুর্দ্দিকে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে—তেমন সময়ে সামান্য শব্দ হইলেই তাহার প্রতিধ্বনি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। সে শব্দ শুনিয়া রোগিণীর দেবর অহিশেখর শঙ্কিত হইল। শঙ্কাপ্রযুক্ত, গৃহশায়িত আর একজনকে সে ডাকিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সে সবে মাত্র নিদ্রামগ্ন হইয়াছে—কিছুতেই সে আর উঠিতে চাহিল না। অহিশেখর তাহাকে ধাক্কা মারিয়া উঠাইল। চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি—কি—কি হয়েছে?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অহিশেখর প্রশ্নকর্ত্তার "গা" ঠেলিয়া গৃহের উত্তর পশ্চিম কোণস্থ উচ্চ প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে কি একটা দেখাইয়া দিল। শব্দটা সেই গবাক্ষপথ হইতেই আসিতেছিল। সে শব্দ শুনিয়া দুই জনই বিশেষ ভয় পাইল। তবে অহিশেখর অপেক্ষা অপর ব্যক্তিটীর সাহস কিছু অধিক ছিল সে বলিল—"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়—ও পোকা মাকড় কি আর কিছু হ'বে।"

অহিশেখরকে সে সাহস প্রদান করিল বটে, কিন্তু সে অহিশেখরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিল।

রোগিণী একটা অমানুষিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা—"যাই যাই—যাচ্ছি।"

অহিশেখর দ্রুতপদে আসিয়া শিবসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বৌদিদি—কি বল্‌ছ ?"

শিবসুন্দরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ—তুমি এসেছ—বেশ করেছ! এই যাই। এতদিন কোথা' ছিলে? যাই, যাই, একটু দাঁড়াও না।"

"বৌদিদি—বৌদিদি!"

"হুঁ হুঁ—রমিকে একবার দেখেই তোমার সঙ্গে যা'ব, একটু দাঁড়াও না!"

রোগিণীর প্রলাপবাক্য শুনিয়া অহিশেখর প্রভৃতি শিহরিত হইল। সেই গবাক্ষপথে অমানুষোচিত শব্দ, আর এই প্রলাপ-বাক্যের মধ্যে যে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা অবশ্য তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। অহিশেখর ভাবিতে লাগিল, তাহার ভ্রাতৃজায়ার আর জীবনের আশা নাই। ভ্রাতৃজায়ার অর্থালঙ্কারগুলি রমেন্দ্রের নিকট হইতে কেমন করিয়া সে আত্মসাৎ করিবে—সেই চিন্তাই তখন তাহার প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। পত্র ও টেলিগ্রাম্ পাইয়াও রমেন্দ্র আসিতেছে না

দেখিয়া সে মনে মনে তাহাকে অসংখ্য গালি পাড়িতে লাগিল। মৃত্যুকালেও শিবসুন্দরী, রমেন্দ্রের কথা ভুলে নাই ; প্রলাপবাক্যের মধ্যেও রমেন্দ্রের নাম বিস্মৃতা হয় নাই দেখিয়া অহিশেখরের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, রমেন্দ্র যদি না আসে, তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইবে। তাহার ভ্রাতৃ-জায়ার অলঙ্কারপত্রাদি আদায় করিয়া লইতে তাহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না।

কয়েকদিন হইতেই ঝড় বৃষ্টি বর্দ্ধমানে খুব হইতেছিল। সে রাত্রে তিন চারি ঘণ্টার জন্য একটু "ধরণ" করিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের শব্দ সময়বিশেষে সুমিষ্ট হইলেও রোগিণীর রোগশয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে শব্দ অহিশেখরের আর ভাল লাগিল না। নীরবতার মধ্য-স্থলে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইলে ভীতির সঞ্চার হয়। অহিশেখরেরও সেই অবস্থা হইল। তথাপি কিন্তু সে তাহার ভ্রাতৃজায়ার অর্থা-লঙ্কারের কথা ভুলিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, যে সকল পেটারা পুঁটলী তাহার ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে আসিয়াছে, সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া একবার দেখে, তাহার মধ্যে ভ্রাতৃজায়ার অলঙ্কারাদি আছে কি না। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে শিবসুন্দরীর মুখে সে শুনিয়াছিল—শিবসুন্দরীর অর্থালঙ্কারাদি সমস্তই রমেন্দ্র-কিশোরের নিকট আছে—এবং রমেন্দ্রের বিবাহ হইলে, শিবসুন্দরী সেগুলি নববধূকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিবেন।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, রমেন্দ্র যদি একান্তই বিবাহ করিতে না চাহে, তাহা হইলে, তিনি ৺কাশীবাস করিবেন এবং তাঁহার অর্থালঙ্কারাদিই তাঁহার কাশীবাসের সাহায্য করিবে—রমেন্দ্রের দান তিনি গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহার পেটারা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াই বা অহিশেখরের লাভ কি? শিবসুন্দরীর উপরেও অহিশেখরের দারুণ ক্রোধ হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—অলঙ্কারপত্রগুলি কেন তাহার ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে করিয়া আনে নাই; তাহা হইলে আজ ত অহিশেখরকে এত ভাবিতে হইত না।

কিন্তু ভাবনা-স্রোতে সে বাধা-প্রাপ্ত হইল। গবাক্ষপথে বিদ্যুতালোক প্রবেশ করিয়া অন্ধকারপ্রায় গৃহ নিমেষের জন্য আলোকিত করিয়া তুলিল। সে আলোকে অহিশেখর দেখিল, তাহার বহুকালের মৃত ভ্রাতা তর্জ্জনী হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে অহিশেখর চক্ষু মুদ্রিত করিল। হতভাগ্য বুঝিতে পারিল না—ইহা তাহারই পাপের শাস্তি, তাহারই কুচিন্তার ফল, তাহারই মস্তিষ্কের বিকার। সে তর্জ্জনী হেলন দেখিয়াও যদি সে ভবিষ্যৎজীবনে সাবধান হইত, তাহা হইলেও তাহার রক্ষার উপায় হইতে পারিত—পাপী কিন্তু সতর্কতার ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।

মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার মধ্য দিয়া প্রভাতালোক

ফুটিয়া উঠিল। সে আলোক-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একখানা গো-শকট মিত্রবাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছত্‌রিওয়ালা গো-শকট হইতে বৃষ্টিধারা-সিক্ত রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত অবতরণ করিয়া বাটীর একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"পিসীমা কেমন আছেন?"

ভৃত্য পুরাতন। রমেন্দ্রকিশোরের বাটীতে সে বহুবার গিয়াছে। সে রমেন্দ্রকিশোরকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বহির্ব্বাটীতে গোলযোগ শুনিয়া অহিশেখর বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল এবং রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রতকে দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"বড় সময়ে এসেছ। বৌদিদিকে আর বাঁচা'তে পার্‌লেম্ না।"

সে কথা বলিতে বলিতেই অহিশেখরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে অশ্রু দেখিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রতের চক্ষু নিরশ্রু থাকিল না।

রোগিণীর আনুপূর্ব্বিক অবস্থার কথা বলিতে বলিতে অহি-শেখর তাহাদের বাটীর ভিতর লইয়া গেল। আর্দ্রবস্ত্রাদি পরি-বর্ত্তন করিবার অবসর গ্রহণ না করিয়াই রমেন্দ্র ও সত্যব্রত রোগিণীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে রমেন্দ্র রোগিণীর রোগশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল—পিসীমা!

রমেন্দ্রের সে করুণ আহ্বান শিবসুন্দরীর কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে

রমেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি তাহাকে চিনিতেই পারিতেছেন না। আবেগের সহিত রমেন্দ্র কহিল—

"আমি, পিসীমা, আমি—রমি।" স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় রোগিণী অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন—

"রমি! আয়, ব'স।"

রোগিণীর পূর্ব্বরাত্রের সেই চীৎকার, সেই প্রলাপ,—এখন আর কিছুই নাই। বেশ সহজ জ্ঞানে, বেশ সহজ ভাবে তিনি কহিলেন—

"রমি! আয় ব'স।" তবে কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ!

অহিশেখর রোগিণীর সে ভাব দেখিয়া মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইল। যাহার এমন সহজ জ্ঞান, তাহার সম্মুখে সে কেমন করিয়া অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার প্রস্তাব করে। বিশেষ, রোগিণীর স্নেহের পাত্র যখন তাহার সম্মুখেই উপস্থিত।

অহিশেখর রোগিণীর গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে ভাবিল, সময় বুঝিয়া সে স্বকার্য্য সাধন করিবে।

শিবসুন্দরীর আকৃতি একবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। সত্যব্রত তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইতেছিল—শিবসুন্দরী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"রমি"

রমেন্দ্রকিশোর আবার ফিরিয়া আসিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে

বসিয়া তাঁহার হাতখানি অতি কোমল ভাবে ধারণ করিয়া কহিল—

"কি পিসীমা!"

"বস।"

"বসেই ত আছি পিসীমা।"

বসেছিস্—আচ্ছা আমি যে মরি রমি,—আর তুই কোথা' ছিলি রমি?"

রমেন্দ্র সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—নীরবে সে অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। শিবসুন্দরীর দৃষ্টি সে দিকে পড়ে নাই। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"বিয়ে কর্‌বি রমি?"

অনন্যোপায় রমেন্দ্রকিশোর পিসীমাতার তুষ্টিসাধনার্থে তাড়াতাড়ি বলিল,—"কর্‌ব পিসিমা, তুমি ভাল হ'বে বল?"

শিবসুন্দরীর অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—"আঃ বাঁচ্‌লেম্। তোর জন্য আমি ক'নে পর্য্যন্ত মনে মনে ঠিক্ ক'রে রেখেছি। তোর সঙ্গে বেশ সাজ্‌বে। তারা বড় গরীব। তা' হ'ক্—মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, বড় সুন্দরী।"

যে কন্যাটীর কথা শিবসুন্দরী কহিতেছিলেন, সে অহিশেখর মিত্রের এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। তাহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি। অর্থাভাবে সে বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বিবাহ দিতে পারে নাই। মিত্রপরিবারের সুবৃহৎ বাটীর অনতিদূরে একখানি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরে তাহারা বসবাস করে। অহিশেখর মিত্রের তাহারা বিশেষ অনুগত।

শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে আসা পর্য্যন্ত কন্যাটী প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে। তাহার নাম মনোরমা—পিতামাতার আদরের নাম রমা। মনোরমা সুন্দরী ও সুলক্ষণা। মনোরমার সহিত রমেন্দ্রের বিবাহ হইলে রমেন্দ্র যে সংসার পাতিয়া সুখী হইতে পারে, এমন বিশ্বাস শিবসুন্দরীর হইয়াছিল। কিন্তু শিবসুন্দরী তখন অভিমানে আত্মহারা। হৃদয়ের বাসনা তাঁহার হৃদয়েই বিলীন হইল। তৎপরে তিনি রোগশয্যায় শয়িতা হইলেন। তথাপি রমেন্দ্রকে সংসারী করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনের কোণে জাগিয়া রহিল। মৃত্যু-কালে রমেন্দ্রকে নিকটে পাইয়া তিনি তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন। তাহাতে বৃদ্ধার মৃত্যুকালেও সুখ। সেই সুখে তাঁহার শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হাসিবার আরও একটু কারণ ছিল। রমেন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তুমি ভাল হ'বে বল ?" মরণের রথে আরোহণ করিবার জন্য যিনি বসিয়া থাকেন, এ প্রশ্নে তাঁহার আস্যে হাস্য ফুটিয়া উঠিবে বৈকি ?"

সত্যব্রতকে নিকটে ডাকাইয়া শিবসুন্দরী কহিলেন—সতু, আমার রমিকে তুই দেখিস্। তা'রে দে'খ্‌বার আর বড় কেউ রইল না। সে ভার আমি তোরে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলেম্।

সে কথায় সত্যব্রত আর কোনও কথা কাহতে পারিল না। তখন তাহার চখের পাতা অশ্রুসিক্ত—তাহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইল না।

অহিশেখর সেই সময়ে শিবসুন্দরীর অর্থালঙ্কার ও তৈজস-পত্রাদির কথাটা একবার তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইল। শিবসুন্দরী তখন রমেন্দ্রের কথাই কেবল কহিতেছেন। অন্য কাহারও কথা তিনি আর বড় কাণে তুলিলেন না। অহিশেখরও ভাবিল, এখন আর এ সকল কথা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার আবশ্যক নাই। ভ্রাতৃজায়া যদি কুবুদ্ধি-বশে দানপত্রে স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। তাহার অপেক্ষা সময় বুঝিয়া দানপত্রের কথা তুলিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। আর দানপত্রের ইঙ্গিতটাও আপাততঃ করিয়া রাখিয়াছি। সে কথাও রমেন্দ্র ও সত্যব্রত উভয়েই শুনিয়াছে। সুতরাং বোধ হইতেছে, উহাতেই অনেকটা কাজ হইবে।

স্বার্থপর স্বার্থচিন্তাতেই মজিয়া রহিল। দানপত্র স্বীকার করাইয়া লইবার সুবিধা কিন্তু তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। বিধাতার ঐরূপই ত বিধান—ঐটুকুই ত কৌতুক, উহাই ত রহস্য!

সমস্ত দিবস শিবসুন্দরী বেশ সুস্থাবস্থায় রহিলেন। পরি-জনবর্গ ভাবিল, রমেন্দ্রকে দেখিয়া বৃদ্ধা বুঝি আরোগ্য লাভ

করিলেন। সে কথা শুনিয়া রমেন্দ্র আনন্দানুভব করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অহিশেখর তাহাতে সহস্র বৃশ্চিক-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। তবে মুখ ফুটিয়া তাহার ব্যথা বেদনার কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

আহারাদি করিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত পুনরায় শিবসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহাদের দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন —"তোরা একটু ঘুমুগে যা—রাত্ জেগে এসেছিস্, যা' একটু ঘুমুগে।" রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সে আদেশ শিরোধার্য্য করিল।

অপরাহ্নে বৈদ্য আসিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। অহিশেখর কহিলেন—"কেন, উনিত আজ আছেন ভাল, কথাবার্ত্তা ত আজ বেশ সহজ!"

কবিরাজ—কহিলেন—সেইটাই বিশেষ ভয়ের কারণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা বেশ সহজ হয়। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে অধিকতর দীপ্তি প্রকাশ করে।

"বলেন কি—তবে কি—তবে কি"—

"কি আর বলিব,রোগিণীর নাড়ী পর্য্যন্ত যে খুঁজিয়া পাইতেছি না! তবে যে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—সেটা কেবল প্রবল ইচ্ছা-শক্তির জোরে। আমার অনুমান হয়, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত রোগিণী ঐ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিবেন। আরও আমার অনুমান, রোগিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র যদি আরও দুই দশদিন পরে আসিতেন, তাহা হইলেও রোগিণী জীবিতা থাকিতেন।"

"সে কি রকম ?"

"ঐ রকম—মানুষের জীবন মৃত্যু অনেকটা মানুষের প্রবল ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রোগিণীর ইচ্ছা এখন পূর্ণ হইয়াছে। জীবনে তাঁহার আর সাধ নাই, মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিবার তাঁহার আর শক্তি নাই—সামর্থ্য নাই, ইচ্ছাও নাই, সুতরাং রোগিণী এইবার মৃত্যু-কবলিতা হইবেন। তাঁহার নাড়ীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার অনুমান হয়, অদ্য রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ। রাত্রি যদি কাটে, তবে কল্য বেলা দশ ঘটিকার মধ্যে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিবে—আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন।

কবিরাজ যথোচিত ব্যবস্থাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন। উদ্বিগ্ন আত্মীয়গণ ভারযুক্ত হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অহিশেখর দানপত্রের কথাটা আবার একবার এই সময়ে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। প্রাণের কথা তাহার প্রাণেই রহিয়া গেল, "বলি বলি" করিয়া তাহার আর কোনও কথা বলা হইল না।

শিবসুন্দরীর আজ আর কথার বিশ্রাম নাই। ভগ্ন-হৃদয়ে রমেন্দ্রের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া মরণের যাত্রী কহিলেন—আমার যা'বার সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি। তোরা একটু কাঁদ্‌বী বৈ কি। তা' কাঁদ্। কিন্তু দেখিস্ রমি,

আমার কথা ঠেলিস্ না—তা' হ'লে আমার মরণেও সুখ হ'বে না।

রাত্রি দুইটার সময় যাত্রী কহিলেন—"আমার বুক্‌টা কেমন ক'র্‌ছে। রমি আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দে।"

রমেন্দ্র তাহার পিসীমাতার মুখে গঙ্গাজল দিতে লাগিল। সত্যব্রত ঔষধের মোড়ক মুখের নিকট ধরিয়া কহিল—"পিসীমা, ঔষুধটা খাও।" অহিশেখরও সত্যব্রতের অনুরোধে যোগদান করিল, কিন্তু কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষিত হইল না।

শিবসুন্দরী কহিলেন—"গঙ্গাজলই আমার ঔষধ।"

শিবসুন্দরী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—তাঁহার পতি-দেবতা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজনের মুখে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিতে করিতে শিবসুন্দরী মহা প্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত প্রভৃতি কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ তুমুল হইতে তুমুল-তর হইতে লাগিল। বৃষ্টি খুব অধিক নহে—তবে ঝড়ের জন্য সে শব্দ অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। লোকান্তরিতা শিবসুন্দরীর প্রিয়জনবর্গের আর্ত্তনাদ প্রকৃতির আর্ত্তনাদের সহিত মিশাইয়া গেল। প্রকৃতি তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কয়েক দিনের দারুণ বর্ষায় ইতঃপূর্ব্বে দামোদর নদে "ঢল" নামিয়াছিল। তাহাতে নদের জল উচ্ছ্বসিত ও কুলপ্লাবী হইয়া উঠে। বর্দ্ধমানের শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সে ব্যাপার দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে সে কথা ঘোষিত করা হইল এবং যাহাতে স্থানীয় অধিবাসিগণ বন্যার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, সে বিষয়েও উপদেশ ও পরামর্শ দান করা হইল কিন্তু সাধারণ জনমণ্ডলী বিশেষ সতর্ক হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিতে পাইল না। তাহারা ভাবিল, দামোদরে প্রতিবৎসরই "ঢল" নামে, বন্যা আসে, ইহার জন্য সতর্ক হইবার আবশ্যকতা কি ?

বন্যার প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার গল্পগুজব করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"বলিস্ কি রে ? তোরা কেউ বড় বানের কথা শুনেছিস ? সে কি বান রে ! শোন্ তবে বলি। একটা কাক প্রতিদিন একটা বাঘের মাথায় ব'সে ঠকাঠক্ ঠোকর মা'রত ! বাঘ নর্ত্তনকুর্দ্দন ক'রেও বায়সকে ধ'র্‌তে পা'র্‌ত না। তা'রপর—বুঝ্‌লে কি না—তার'পর কাক তখন কা-কা শব্দ করে বাঘকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। বাঘ মশায় সে যাত্রা বায়স প্রভুর কিছু কর্‌তে না পেরে—বুঝ্‌লে

কিনা—প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—আচ্ছা, থাক্, এখন কাকের পো, বড় বানটা একবার আসুক্, তখন তোমাকে ধ'রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে তোমার হাড় খাব, মাস খা'ব, রক্ত খাব। হাঁ, তবে আমার নাম বাঘের বেটা বাঘ।"

"তা'রপর বুঝ্‌লে কি না,—তা'রপর সত্য সত্যই একদিন বান ডাক্‌ল, বাঁশ গাছ ডুব্‌ল, তালগাছ না'রকেল গাছ ডুব্‌ল। আর বাঘের পো—বুঝ্‌লে কি না—কাকটাকে না ধ'রে ফেলে ঘাড়ে এক কামড়। ব্যাস্, কাক প্রভু তখন অজ্ঞান অচেতন, নড়ন চড়ন রহিত। তা'র পালকগুলি সন্ সন্ ক'রে স্রোতে ভেসে বেরিয়ে গেল। কাক-প্রভু তখন বুঝ্‌লে, বাঘ কি জিনিস, আর বানই বা কি জিনিস্! বুঝ্‌লে, একে বলে বাণ। বান কি আর গাছের ফল হে, যে ঝর্‌লেই হ'ল? আর বান এসেই বা আমাদের ক'র্‌ছে কি? চারিদিকে বাঁধ,—বাঁধ ব'লে বাঁধ, প্রবল বাঁধ—বুঝ্‌লে কিনা—বানে আমাদের ভয়টা কিসের?"

অন্য এক ব্যক্তি মনের সুখে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—

"আমিও যে অমন বানের কথা না জানি, তা' নয় হে! একদিন এমন বান এসেছিল—কথাটা মেনে নাও হে, মেনে নাও— যে বানের স্রোতে নগরকে নগর ভেসে বেরিয়ে গেল। একটা দেশ ভেসে গিয়ে আর একটা দেশের সঙ্গে জোড়া

লেগে গেল। বাঘ, সিংহ, গো, মহিষ, সর্প, ময়ূর সব একসঙ্গে এক গাছে আশ্রয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরের ভাইবোনের মত হ'য়ে প'ড়্ল। আমিও কি আর বানের গল্প জানিনা হে।”

এইরূপ গল্পগুজবে সকলে আপনাপন সাহস ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আসন্ন বন্যার ভয়ে কেহ আর বিশেষ ভীত হইল না। সকলেই ভাবিল, প্রতিবৎসরের মত বন্যা আসিবে, এক আধ দিন থাকিবে, তৎপরে জল শুকাইয়া যাইবে। তবে দুই দশজন সতর্ক ব্যক্তি গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে চলিয়া গেল। তাহাদের কাপুরুষতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নির্ভীক গল্পগুজবকারিগণ হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কহিল—“ওঃ লোকগুলার কি ভয়!”

যাহাহউক, গল্পগুজবে কিম্বা হাসির ঘটায়—“বানডাকা” কিন্তু বন্ধ হইল না। গভীর রাত্রে দামোদর সহসা স্ফীত হইয়া রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। নদ ক্রমেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত উদ্দাম জলরাশি বাৎসরিক বন্যার নির্দ্দিষ্ট সীমা ক্রমেই অতিক্রম করিতে লাগিল। জলকল্লোলের ভীম ভীষণ নাদ ঝটিকাশব্দের সহিত মিলিত হইয়া নদ-সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল! বন্যাস্রোতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। জলরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রামান্তরে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকা। গ্রামবাসিগণ সকলেই প্রায় গাঢ় নিদ্রাভিভূত। ক্বচিৎ দুই এক

জন জাগরিত হইয়াছে—আর জাগিয়া আছে, রমেন্দ্র সত্যব্রত প্রভৃতি। রমেন্দ্রের পিসীমাতা শিবসুন্দরী সেই সবেমাত্র প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। শোক-ব্যথায় শিবসুন্দরীর আত্মীয়গণ তখন হা-হুতাশ করিতেছে।

প্রবল বাত্যায় গৃহস্থিত দীপালোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ভৃত্য পার্শ্বের গৃহ হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিবার সময় সভয়ে দেখিল, প্রাঙ্গণে জলতরঙ্গ ছুটিতেছে। চীৎকার করিয়া সে সকলকে আহ্বান করিল। সকলে সে স্থানে সমবেত হইয়া দেখিল, ব্যাপার ভীষণ—প্রাঙ্গণস্থ জল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

প্রভাতালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগ্রামান্তর সহর প্রভৃতি জলমগ্ন হইল। কাঁচা ঘরগুলির প্রাচীর ধসিয়া গেল, চাল উড়িয়া গেল, অবশেষে স্রোতের জলে সমস্ত ভাসিয়া গেল। চালার মধ্যে প্রবল স্রোতে জল প্রবেশ করিতেই অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ চালের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই জলে ভাসিয়া গিয়াছিল ; এইবার যাহাদের চাল ভাসিল, তাহারা আশ্রয়চ্যুত হইয়া ভাসিয়া চলিল। যাহাদের একতলা বাড়ী, তাহারা গৃহের ছাদে উঠিয়া পড়িল, যাহাদের দ্বিতল গৃহ, তাহারা একতলা হইতে দ্বিতলে ছুটিয়া পলাইল। কারণ তখন অনেক একতলাও প্রায় জলমগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের

অনেক জিনিসপত্র তখন ভাসিয়া গিয়াছে, অনেকের গৃহমধ্যস্থিত খাট পালঙ্কাদি তখন গৃহমধ্যেই ভাসমান। উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তখন অনেকে প্রাণ রক্ষার উপায় করিল। কিন্তু অনেক বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল—তাহাতে অনেকেরই প্রাণবিয়োগ ঘটিল। গো, মহিষ এবং অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য জন্তু প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সে কি স্রোত, কি ঘূর্ণাবর্ত্ত, কি তরঙ্গ-ভঙ্গ! ক্রোশের পর ক্রোশ, গ্রামের পর গ্রাম ব্যাপিয়া সে উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি নৃত্য করিতে লাগিল। সকলেরই মনে হইল, জনপদ বুঝি মহাসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অনন্যোপায় হইয়া শিবসুন্দরীর আত্মীয়স্বজনগণ শিবসুন্দরীর মৃতদেহ তখন একতলা হইতে দ্বিতলে বহন করিয়া লইয়া গেল। তখন সে বাটীর সকলেই ভাবিতে লাগিল—শবদেহের সৎকার হয় কেমন করিয়া, আর শবদেহের সৎকার না হইলে হিন্দুয়ানী রক্ষাই বা হয় কেমন করিয়া?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—দিবাকরের কিরণ-ধারা আর ধরাতলে নামিতে পারিতেছে না। জমাট মেঘমালা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতির দারুণ নির্ম্মমতা প্রকাশ করিতেছে। উপরে ব্যোম-পথে সেই নির্ম্মমতা, সেই প্রলয়কালীন ছায়া, আর নিম্নে—ভূমিতলেও সেই নিষ্ঠুরতা—সেই ভীষণতা, সেই প্রাণহীনতা। কোথায় এখন প্রকৃতির সে শ্যাম-শোভা—লাস্যলীলা? তাণ্ডব নৃত্য, অট্টহাস্য—বিকট শব্দে দিগ্‌-দিগন্ত এখন প্রকম্পিত। মহাপ্রলয়ের প্রলয়-তরঙ্গে পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়! সে অন্ধকার, সে বাত্যা, সে বৃষ্টি, সে প্লাবন, সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া সকলকে বুঝিতে হইল। তখন সকলের আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

জল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে মরিল ধনে প্রাণে—আর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল, সে যাত্রা আর কাহারও রক্ষা নাই।

অসংখ্য জীবজন্তুর মৃতদেহ জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; —জীবন্ত অনেক প্রাণীও ভাসিয়া চলিল। কেবল একটী মৃতদেহ এখনও পর্য্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত! সে মৃতদেহ শিবসুন্দরীর, রমেন্দ্রকিশোর তাহার মৃতা পিসীমাতাকে লইয়া বসিয়া আছে—

সে ভাবিতেছে, মৃতদেহের কেমন করিয়া সৎকার করা যায়। শোকাচ্ছন্ন হইলেও রমেন্দ্রকিশোর আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় নাই। মৃতদেহের সৎকারের জন্য সে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

অহিশেখর কহিল—"এ অবস্থায় আর কেমন ক'রে কি করা যেতে পারে। মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়াই আপাততঃ সুবিধা-জনক। এখন আপনাপন প্রাণ বাঁচান ভার হ'য়ে উঠেছে—মৃত দেহ গৃহে রক্ষা ক'রে আর ফল কি?"

সে কথায় রমেন্দ্রকিশোর আস্থাবান্ হইতে পারিল না। সত্যব্রতের সহিত পরামর্শ করিয়া সে স্থির করিল—মৃতার মুখাগ্নি কার্য্য করিতেই হইবে।

কিন্তু সে কার্য্য কেমন করিয়া করিতে পারা যায়! ভীষণ জলপ্লাবনে দেশটা যে তখন ডুবিয়া গিয়াছে।

বহু চিন্তার ফলে সত্যব্রত এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিল। একখানা পুরাতন "শালতি"র যোগাড় করিয়া তাহার উপর চিতা সজ্জিত করা হইল। সেই চিতার উপর মৃতদেহ রক্ষা করিয়া রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসীমাতার অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিল। অগ্নিসংযোগ করিয়া "শালৃতিখানাকে" বাহির জলে ঠেলিয়া দিতেই "শালৃতিখানা" স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে "শালৃতি" আর দেখিতে পাওয়া গেল না, কেবল ধূম ও ক্ষীণালোক পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর

তাহাও আর দৃষ্টি হইল না। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্বিতল হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিল।

প্রাঙ্গণের মধ্যে যে হ্রদ বা পুষ্করিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জলে স্নান করিয়া সকলে "শুচি" হইল। এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত দিনের অনাহারের পর সকলে সামান্য "জলযোগ" করিয়া বিশ্রাম করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সকলেই তখন নিদ্রালু—কিন্তু নিদ্রা বড় কাহারও হইল না। তাহার কারণ দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা—কেবল শিবসুন্দরীর মৃত্যুর জন্য নহে—দেশে ভীষণ জলপ্লাবনের জন্যও তাহারা চিন্তিত হইল।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ঝড় বৃষ্টি ও বন্যা ততই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। হাহাকারে তখন দেশ পরিপূর্ণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে ভীষণ জলপ্লাবনের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে কলিকাতায় একটা করুণ সহানুভূতির স্রোত বহিতে লাগিল। কার্য্যোপলক্ষে যাহারা বৰ্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা বিপন্ন আত্মীয়স্বজনগণের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; বৰ্দ্ধমানে যাহাদের আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব আছে, তাহারাও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; আর যাহারা বর্দ্ধমানের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য, তাহারাও সহানুভূতিবশে কাতর হইয়া পড়িল। পোষ্ট আফিস্, টেলিগ্রাফ্ আফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য—বর্দ্ধমানের সংবাদশ্রবণের জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল—"বর্দ্ধমানের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে," কেহ বলিল "দশ বিশ সহস্র লোক মারা পড়িয়াছে," আর কেহ কেহ বলিল, "বৰ্দ্ধমান একবারে ভাসিয়া যায় নাই, লোকও তেমন মরে নাই—তবে গো, মহিষ, ছাগবংশ একবারে লোপ পাইয়াছে এবং শস্যাদিরও বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে।"

বৰ্দ্ধমান-বার্ত্তা শ্রবণান্তর বীর্য্যবান্ স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্য

আহার্য্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহা লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে রেলপথে যাত্রা করিল। বহু ধনী ও ধনীর সন্তানগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের আদর্শে আর্ত্ত-সেবার জন্য জলপ্লাবিত দেশাভিমুখে রওনা হইল। যাহারা দুর্ব্বল, বিলাসী, স্বার্থপর অথবা "কাজের লোক" তাহারাই মাত্র বসিয়া বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিল, গল্প শুনিতে লাগিল ও শুনাইতে লাগিল। বন্যার সংবাদ নানাস্থান হইতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ হইল। তারকেশ্বর হরিপাল প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ আসিল—তারকেশ্বরের মন্দির প্রায় জলমগ্ন হইয়াছে। তৎপরে শুনা গেল, আমতা ডুবিয়াছে, রাধানগর ডুবিয়াছে; মেদিনীপুর, কাঁথি প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে ; পাটনা, দ্বারবঙ্গ যায় যায়, শোণ-সেতুর কোল পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। অন্যান্য নানা স্থান হইতেও জল-প্লাবনের সংবাদ আসিতে লাগিল। তাহা শ্রবণান্তর অনেকেরই ধারণা হইল, মহাপ্রলয়ের দিন বুঝি আগত প্রায়, নতুবা এমন হইবে কেন? কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ডায়মণ্ড হারবার ইতঃপূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইতে বসিয়াছিল—দৈব-কৃপায় রক্ষা পাইয়াছে, আবার সংবাদ আসিল, ডায়মণ্ড হারবার আবার যায় যায়, ললিতাকুড়ির বাঁধও প্রায় "ভাঙ্গো ভাঙ্গো" হইয়াছে, এমন কথাও জনরবে প্রকাশ পাইল। অনেকেই ভাবিতে লাগিল—কলিকাতাও বুঝি এইবার যায়। জনরবের লক্ষজিহ্বা ব্যাপারটাকে ভীষণতর করিয়া তুলিল। জননীরূপিণী রমণীগণ সে সংবাদ

শ্রবণান্তর নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও বিপদবারণ মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

দেশের সর্ব্বস্থানেই প্রায় যখন এইরূপ অবস্থা, ক্রন্দনের রোল যখন চারিদিকেই উত্থিত হইয়াছে, তখন কলিকাতার অনতিদূরে কালীঘাটে একটি ভগ্ন দেবমন্দিরে বসিয়া এক জ্যোতি-র্দীপ্ত সন্ন্যাসী হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার একটী তরুণ বয়স্ক শিষ্যকে কহিতেছিলেন—

"মা'র আমার সংহারমূর্ত্তির কথা ত শুন্‌লি বাবা! মা আমার গড়্‌তেও যেমন, ভাঙ্গ্‌তেও তেমনি। লীলা—লীলা—মা আমার লীলাময়ী।"

শিষ্য সে কথায় কোনও কথা কহিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা ভাবিতে লাগিল। গুরুদেব—বিমলানন্দ ভারতী, শিষ্যের নাম নবীনানন্দ।

বিমলানন্দ, নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ স্থানটা আর তেমন ভাল লাগ্‌ছে না—না বাবা?"

নবীনানন্দ কহিল—"কি জানি, মনটা কেমন কেমন্ কর্‌ছে।"

"হুঁ, তা'ত কর্‌বারই কথা। তা এখন কোথায় যা'বে বাপু?"

"বাড়ী।"

বিমলানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তা'ত যা'বে। কিন্তু যা'র কাছে যেতে চাও, সে ত এখন জলে ভাস্‌ছে। কা'র কাছে যা'বে বাপ্!" নবীনানন্দ গুরুদেবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া

রহিল। সে জানিত, তাহার গুরুদেব ত্রিকালজ্ঞ, সুতরাং তাহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, তাঁহার কথা অভ্রান্ত—অখণ্ডনীয় সত্য।

বিমলানন্দ কহিতে লাগিলেন—"তোমার বাটী যাওয়ায় আমার আপত্তি নাই। এখন একপ্রকার সুস্থও হয়েছ। তবে—তবে—"

শিষ্য নবীনানন্দ বস্তুতই বয়সে নবীন, অনুমানে বোধ হয় সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর কৃশ। সহসা দেখিলে মনে হয়, সে যেন কোনও দুরন্ত ব্যাধির কবল হইতে কোনও রূপে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার গুরুদেব বিমলানন্দ সুস্থকায়, সবল দেহ—বয়স অনুমান করা সুকঠিন। জীবহিতেই তাঁহার আনন্দ—তাঁহার আর অন্য কাম্য নাই।

জীবহিতাকাঙ্ক্ষী গুরুদেবের মুখে সেই "তবে তবে" শুনিয়া নবীনানন্দ একটু শিহরিত হইল। তাহার বাটী যাইবার তখন প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেব তাহাতে যেন কতকটা বাধা দিতেছেন। নবীনানন্দের রোগশীর্ণ দেহে একটা উত্তেজনা আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বিমলানন্দ হাসিয়া কহিলেন—"সংসারী লোকের বিপদ ওইখানে। তা'রা বুঝে না কিছু, আর বুঝালেও তা'রা বুঝ্‌বে না। হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমার সুখ-শান্তির হন্তারক?"

শিষ্য অপ্রতিভ হইল—করযোড়ে গুরুদেবের নিকট মার্জ্জনা

ভিক্ষা করিল। গুরুদেব শিষ্যকে মার্জ্জনা করিলেন না—হাসিয়াই কথাটা উড়াইয়া দিলেন। গুরু ও শিষ্যে আবার কথোপ-কথন হইতে লাগিল—সে কথা জল-প্লাবন সম্বন্ধে।

নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, দেশটা কি সত্যই ভেসে গেছে ?"

বিমলানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাইতে লাগিলেন—

ভাসা ডোবা কে জানে কেমন !
ভাসা ডোবার কোন্‌টা ভাল
(তাই) ভাবি অনুক্ষণ।
সাধ—ডুবি রূপ-সাগরে
ডুব দিয়ে গো ধরি তা'রে
আবার—সে ভেসে যায়,
লুকায় কোথায়
তা'র কতই-গো ছলন।

গীতান্তে বিমলানন্দ হাসিয়া কহিল—"হ'বে, তা ভাস্‌তেও পারে, ডু'ব্‌তেও পারে। তা'তে হ'ল কি ?"

নবীনানন্দ কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া. কতকটা আপনাকে সাম্‌-লাইয়া বলিল—

"না তাই বল্‌ছি। আপনি কি বাঁচিয়ে দিতে পারেন না—যেমন আমায় বাঁচিয়েছেন ?"

বিমলানন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে নবীনানন্দ

অধিকতর অপ্রতিভ হইল। পরক্ষণেই বিমলানন্দ অতি কোমল ভাবে কহিলেন—"প্রস্তুত হও বৎস, আর্ত্তোদ্ধারে আমাদের যাত্রা করতে হ'বে। তখন বুঝ্‌বে কে বাঁচে, কে ডোবে। যা' প্রত্যক্ষ করবার সুবিধা আছে, পরোক্ষে তার বিচারের আবশ্যকতা কি?"

নবীনানন্দের বাটী যাইবার অভিপ্রায় আর রহিল না। সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল। গুরুদেবের সহিত সে আর্ত্তোদ্ধারে যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রে অহিশেখর মিত্রের বাটীর খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল এবং জলস্রোতে বিলীন হইল। সেই অংশের পার্শ্বস্থ গৃহে রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত নিদ্রা যাইতেছিল। পতনের শব্দে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শোকে ও ক্লান্তিতে তাহারা তখন অবসন্ন প্রায়। শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদের আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না; কিন্তু তাহাদের উঠিতেই হইল—গৃহের বাহিরে তখন চীৎকার উঠিয়াছে—

"ঘর ছেড়ে বাহিরে এস, ঘর ছেড়ে বাহিরে এস।" সে আহ্বান অবশ্য অহিশেখরের নহে। ভ্রাতৃজায়ার অলঙ্কারাদি কিরূপে হস্তগত করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাতেই সে তখন আত্মহারা। সত্যব্রত রমেন্দ্রকে টানিতে টানিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা গৃহের বাহির হইতে না হইতেই গৃহখানির অস্তিত্ব জলতলে লুপ্ত হইল। বাটীর পুরাতন অংশ ত্যাগ করিয়া তখন সকলে নূতন অংশে চলিয়া গেল।

সেই অংশের অনতিদূরে অহিশেখরের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। সুতরাং কুটীরবাসেই তাঁহাকে তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। সেই কুটীর-স্বামী হরকুমারের কন্যা মনোরমার সহিত রমেন্দ্রকিশোরের বিবাহের কথা পরলোকগতা শিবসুন্দরী একপ্রকার স্থির

করিয়াছিলেন। পিসীমাতার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রমেন্দ্রকিশোর সে বিবাহ-প্রস্তাবে যে সম্মতি দান করিয়াছিল, তাহাও বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে।

যাহা হউক, আপাততঃ তাহা অবান্তর কথা। সেই কুটীর হইতে করুণ বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং একটা ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া রমেন্দ্রকিশোর প্রভৃতির বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে কুটীরখানি জলতলগত হইয়াছে। হরকুমার তখন চীৎকার করিতেছেন—"কে আছ, ওগো বাঁচাও।"

দারুণ অন্ধকারে সে কুটীরের অবস্থা কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইল না। কেবল করুণ আর্ত্তনাদ সকলকে জানাইয়া দিল, হরকুমারের মাথা রাখিবার আর স্থান নাই—সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে।

সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত, অহিশেখরের মুখের দিকে একবার চাহিল মাত্র। অহিশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"দেখ, যদি কিছু ক'র্‌তে পার। আমার দ্বারা কিছু হওয়া ত এখন একপ্রকার অসম্ভব।"

রমেন্দ্র ও সত্যব্রতের মধ্যে তখনই কি একটা ইঙ্গিত হইয়া গেল। তাহারা বাটীর প্রাঙ্গণস্থ জল ভাঙ্গিয়া "পালকী ঘর" হইতে "শালতি" আনিতে ছুটিল। আর্ত্তনাদের মাত্রা তখন অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। "শালতি" অন্বেষণের অবসর ও সুযোগ

তাহারা গ্রহণ করিতে পারিল না। আর্ত্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহারা উভয়েই জলে ঝম্প প্রদান করিল। রমেন্দ্র তখন আর শোকাচ্ছন্ন, অবসন্ন নহে, তাহার শরীরে তখন মত্ত হস্তীর বল আসিয়াছে। সত্যব্রতও রমেন্দ্রকিশোরের উপযুক্ত বন্ধু। অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুদ্বয় আর্ত্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই উচ্ছ্বসিত পঙ্কিল জলরাশি মথিত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। অহিশেখর ভাবিতে লাগিল—গয়ার পাপ যদি চিরদিনের জন্য বিদায় হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ভগবানের বিচার আছে।

রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, তখন তথায় কুটীরের আর চিহ্নমাত্র নাই।

কুটীরস্বামী চীৎকার করিয়া বলিল—"ও গো বাঁচাও, বাঁচাও ঐ ঐ আমার রমা ভেসে যায়। গেল, গেল, বাঁচাও, বাঁচাও।"

নৈশান্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কেবল অনতি-দূরে জলমধ্যে একটা শব্দ হইল—"বাবা।"

সিংহবিক্রমে রমেন্দ্রকিশোর জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিমজ্জমানা মনোরমার ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সহসা রমেন্দ্রের মুষ্টিমধ্যে কি একটা পদার্থ আসিয়া পড়িল। রমেন্দ্র মুষ্টি দৃঢ় করিল। সে অনুভবে বুঝিল, তাহা কেশগুচ্ছ। প্রাণপণে রমেন্দ্র তাহা আকর্ষণ করিল। আকর্ষিতা মনোরমা আকর্ষণকারী রমেন্দ্রের মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধা হইল। অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তাহারা জলস্রোতে ভাসিয়া

চলিল—স্রোতের টানে তাহারা কূলের দিকে আর আসিতে পারিল না। পিসীমাতার কথা ইরম্মদগতিতে মনে পড়িতেই রমেন্দ্র কিশোর শিহরিত হইল।

হরকুমার ইতিমধ্যে মনোরমার মাতা সাবিত্রীকে লইয়া জলে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। সত্যব্রত তাঁহাদের সহায়তা করিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা স্রোতের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমেন্দ্র ও মনোরমা ভিন্ন অন্যান্য সকলেই সাঁতার দিয়া অতিকষ্টে অহিশেখরের বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনোরমার মাতা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"আমার ছেলে ?"

মাতার ক্রোড়ে শয্যাসমেত শিশুপুত্র ছিল। শিশুর শয্যা যেমন ছিল, তেমনই আছে—নাই কেবল শিশুটি। সন্তরণকালে সে স্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। হরকুমার ও সাবিত্রীসুন্দরী অরুন্তুদ রোদনে চতুর্দ্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সত্যব্রত চীৎকার করিয়া কহিল—"ওরে আমার পাঁচুও ঐ রকমে ডুবেছে রে।"

দশম পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত প্রভৃতি ভাবিয়াছিল, মৃত্যুমুখে পতিতা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া রমেন্দ্রকিশোর পশ্চাতে সাঁতার দিয়া আসিতেছে। সাবিত্রী ও হরকুমারও সেই আশাতেই এতক্ষণ কথঞ্চিৎ স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল অতীত হইলেও যখন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল না, তখন সকলেই তাহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা যে দারুণ বিপদে পড়িয়াছে, সে কথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। সত্যব্রত রমেন্দ্রের প্রাণ সংশয় বুঝিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। সাবিত্রী সুন্দরী ও হরকুমার পুত্র-কন্যার শোকে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সকলকে তখন সান্ত্বনা দিতে লাগিল—অহিশেখর। রমেন্দ্রকিশোর জলস্রোতে অদৃশ্য হওয়ায় অহিশেখর মনে মনে কিন্তু বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছিল—মধ্যে মধ্যে সে ভাব তাহার চ'খে মুখে যে ফুটিয়া বাহির হইতে-ছিল না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ লোকের নিকট তাহা গোপন রাখা বড় কঠিন। অহিশেখর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তথাপি অহিশেখরের শোক ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাত্রা হ্রাস হয় নাই। ইহাই মানব-চরিত্রের রহস্য।

প্রভাতালোকেও রমেন্দ্র ও মনোরমার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন অহিশেখর সকলকে বুঝাইয়া দিল—

স্রোতে তাহারা নিশ্চয়ই ভাসিয়া গিয়াছে এবং জলরাশিমধ্যে তাহাদের জীবন্ত সমাধি হইয়াছে।

ভীষণ জল-প্লাবনে গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর তখন জলমগ্ন। সে জলরাশি জলধির মত অনন্ত-বিস্তার। বন্যার স্রোত ও ব্যাত্যা-সংযোগে "জল-তরঙ্গ" তখন দুর্দ্দমনীয়। সেই তরঙ্গাবর্ত্তে পড়িয়াও রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তরঙ্গমুখে দুইজনেই ভাসিয়া চলিয়াছে। পরার্থে কিশোরের শরীরে তখন দৈববল আসিয়াছে; জীবনরক্ষার্থে কিশোরী তখন অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালিনী। একখণ্ড কাষ্ঠমাত্র আশ্রয় করিয়া তাহারা স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। রমেন্দ্র বুঝিয়াছিল, তাহারা মরণের পথে অগ্রসর। মনোরমা ভাবিতেছিল—যখন সে শক্তিশালী পুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তখন তাহার আর মৃত্যুভয় নাই।

ভাসিতে ভাসিতে তাহারা একস্থানে একটা উচ্চ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। বৃক্ষের কতকাংশ জলে ডুবিয়াছিল। প্রভঞ্জন-বিধ্বস্ত বৃক্ষের কয়েকটি শাখা-প্রশাখা জলোপরি নমিত হইয়া পড়িয়াছিল। রমেন্দ্রকিশোর সেই উচ্চ বৃক্ষের একটী নমিত শাখা আপনি ধরিল এবং মনোরমাকেও ধরিতে কহিল। তৎপরে তাহারা অতিকষ্টে বৃক্ষাগ্রভাগে উঠিতে সমর্থ হইল।

বৃক্ষশাখায় আশ্রয় পাইয়া পরিশ্রান্ত রমেন্দ্রকিশোর পরিশ্রান্তা মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আশ্রয় ত মিলিল, কিন্তু তোমায়

রক্ষা করিতে পারিব কি ?" সে প্রশ্নের উত্তরে মনোরমা কোনও কথা না কহিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার চাহিল মাত্র। রমেন্দ্র তাহার আর্দ্র কেশের সরল গুচ্ছ বাম হস্তে ধরিয়া জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—"ভয় নাই,—আশ্রয় যখন মিলিয়াছে, তখন বোধ হয় আমরা নিরাপদ।" ইঙ্গিতে মনোরমা সে কথার সমর্থন করিল।

সাবধানে ও সুকৌশলে বৃক্ষশাখায় বসিয়া রমেন্দ্র ও মনোরমা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

তরুবরের আশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া মনোরমা দেখিতে লাগিল, অসীম জলরাশি—দূরে অতিদূরে আকাশ-মণ্ডলে মিশিয়া গিয়াছে। সে দৃশ্য মহান্ হইলেও ভীতিপ্রদ। মনোরমা যখন জলে ভাসিতেছিল, তখন এ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হয় নাই—তাহা দেখিবার সে অবসর পায় নাই। বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া সে ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তখন সে বুঝিল, কি ভয়ঙ্কর স্থানে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের পরিণামই বা কি! সে স্থান হইতে বাটী ফিরিবার আশা যে এক প্রকার দুরাশা, তখন সে তাহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লইল। ভয়প্রযুক্ত বৃক্ষশাখা হইতে কিশোরীর পতনের ভয় ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া রমেন্দ্রকিশোর কিশোরীর কটিদেশ ধারণ করিল। মনোরমা তখন ভয় ও ক্লান্তিপ্রযুক্ত দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছিতাপ্রায়। রমেন্দ্রকিশোরও শোকে, অনশনে

ও সন্তরণ-জনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি সে পুরুষ—কর্ত্তব্যসাধনে তাহার মানসিক বলও অপরিমেয়। মানসিক বলের সাহায্যে তাহার শারীরিক বলের অভাব দূর হইল। মানসিক বলের এমনই প্রতাপ! ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিপদ্‌মুক্ত হইতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

রমেন্দ্রকিশোর ভাবিয়াছিল, কোনও প্রকারে রাত্রিটা যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না। রাত্রির মধ্যে যে "জল নিকাশ" হইয়া যাইবে, এমন আশা সে অবশ্য করিতেছিল। তাহা কিন্তু হতাশের আশা! তথাপি জীবন থাকিতে কে আশা ত্যাগ করিতে পারে?

কিন্তু হায়, রমেন্দ্রের সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। যে বৃক্ষে তাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সে বৃক্ষ আর তাহাদের আশ্রয়-প্রদানে সমর্থ হইল না। জলস্রোতে বৃক্ষমূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অনুভূতিশক্তিতে রমেন্দ্রকিশোর বুঝিল, বৃক্ষকাণ্ড ধীরে ধীরে জলের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। রমেন্দ্র স্থির করিল, সে বৃক্ষাশ্রয়ে থাকিয়া আর কোনও লাভ নাই, বরং আশু প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। মূলোৎপাটিত হইয়া মহাবৃক্ষ জলে পড়িয়া যাইলে তাহাদের প্রাণ রক্ষার আর উপায় থাকিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া মনোরমাকে লইয়া সে পুনরায় জলে ঝম্প প্রদান করিতে প্রস্তুত হইল।

রমেন্দ্রের উদ্দীপনায় এবং তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া মূর্চ্ছিতা-প্রায় মনোরমা একটু প্রকৃতিস্থা হইল। মনোরমা যদিও বুঝিল, মৃত্যুর কবল হইতে তাহাদের আর নিস্তার নাই, তথাপি সে জীবন-রক্ষায় ঔদাস্য করিতে পারিল না। জীবের ধর্ম্মই এই। সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে এক "আত্মঘাতী" ভিন্ন অপর কেহ বড় স্বীকার করে না। মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, স্বাভাবিক নিয়মে মনোরমাও শক্তি সঞ্চয় করিল। রমেন্দ্রকিশোর তাহাকে লইয়া বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্রয়দাতা তরুবরও জলশায়ী হইল। তখন জলের স্রোত খরতর। বৃক্ষও ভাসিয়া গেল, আর রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা ভাসিয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই জল-তরঙ্গ, আবার সেই অকূল পাথার, আবার সেই সাঁতার! অকূলে কূল পাইতে অনেক প্রাণীই ভাসিয়া চলিয়াছে, অনেক শবদেহও ভাসিয়া যাইতেছে, অনেক বৃক্ষলতা এবং তৃণসংযুক্ত মৃত্তিকাস্তূপ ও ভগ্ন কুটীরের অংশবিশেষ স্রোতো-বেগে ভাসিতেছে। তখন দেবতার দয়া নিষ্ঠুরতায় পরিণত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। তখন চেতন ও অচেতন উভয়েরই এক অবস্থা—উঠিতেছে, ডুবিতেছে, মরিতেছে, ভাসিতেছে। তখন অপ্রমেয় জলরাশি উদার হইয়াও অনুদার; দ্রব হইলেও প্রস্তর-কঠিন; হিম-শীতল হইলেও জ্বালাময়। কারণ অপ্ তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সংহারব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে—কিন্তু অদার্শনিকের তাহাতে সুখ কোথায়?

সেই প্রলয়-পয়োধি-জলে ভাসিতে ভাসিতে রমেন্দ্র ও মনোরমা মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের জীবনের আশা যে আর নাই, তাহা তাহারা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছিল। তথাপি আশা কুহকিনী। আশার কুহকে আশায় আশায় তাহারা ভীষণ জলতরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। মরণের পথের পথিক তাহারা,—দিক্‌শূন্য দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে আর তাহাদের তেমন ভয় রহিল না।

মনোরমার দৈহিক শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, হস্ত পদ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল—সে আর সন্তরণ করিতে পারিতেছিল না—রমেন্দ্রকেই তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছিল। কিন্তু রমেন্দ্রও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সে ভার আর কতক্ষণ সে বহন করিতে পারে? সেও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শোকে, অনশনে ও দৈবদুর্ব্বিপাকে সে পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এইবার শক্তিহীন হইয়া পড়িল। প্রকৃতির ভীষণতার বিরুদ্ধে আপনাকে ও মনোরমাকে সে আর কতক্ষণ রক্ষা করিবে! সে বুঝিল, এই স্থানেই তাহাদের শেষ—এই স্থানেই তাহাদের বিদায়—এই স্থানেই তাহাদের সমাধি।

প্রাণপণে রমেন্দ্রকিশোর দক্ষিণ বাহুমধ্যে মনোরমাকে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনের ভাব—মরিতে হয়, তাহারা দুইজন একত্রে মরিবে। মনোরমা তাহার আশ্রিতা—একাকিনী সে জলমগ্না হইবে কেন? যখন মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতা একা একা মরিবে কেন—উভয়ের মৃত্যুই শ্রেয়। কে জানে ইহা কেমন বন্ধন, কেমন সহানুভূতি, কেমন যুক্তি, কেমন বিচার!

সে যাহা হউক, সকল যুক্তি, সকল বিচার রমেন্দ্রকিশোরের নিকট পরাজয় মানিল। মনোরমার সহিত রমেন্দ্র মরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে—কে তাহা তখন নিবারণ করে?

কিন্তু নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। ভগবান্ তাহাদের রক্ষা

করিলেন। স্রোতোবেগে একখণ্ড কাষ্ঠ তাহাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রমেন্দ্র কাষ্ঠখণ্ডখানি ধরিয়া ফেলিল এবং মনোরমাকেও তাহা ধরিতে বলিল। মনোরমা তখন মৃতপ্রায়। তথাপি জীবনের আশায় সে তাহা বহুকষ্টে ধরিল। কাষ্ঠখণ্ডের উপর দেহের ভার রক্ষা করিয়া তাহারা উভয়ে ভাসিয়া চলিল। অসীম বিস্তৃত জলরাশির উপর ভাসিয়া যাওয়ায় তাহাদের আর বিরাম নাই।

কাষ্ঠখণ্ডখানি আশ্রয়স্বরূপ পাইয়া তাহারা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ বল সঞ্চয় করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। শীতাধিক্য বশতঃ তাহারা বরং দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছিল। তবে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহারা কাষ্ঠখণ্ড-খানি ধরিয়া রহিল। সেই অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে যাইতে তাহারা উভয়েই ক্রমে চৈতন্য হারাইল। কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড তাহারা ত্যাগ করে নাই। আকর্ষণবলে অচৈতন্যাবস্থাতেও কাষ্ঠখণ্ড তাহাদের হস্তমধ্যে আবদ্ধ ছিল। আকর্ষণবলেই আলিঙ্গনাবদ্ধ কাষ্ঠখানি তাহাদের আলিঙ্গন-চ্যুত হয় নাই।

রমেন্দ্র ও মনোরমা যখন সেইরূপ অবস্থায় তরঙ্গের মাথায় মাথায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাদের অনতিদূরে কয়েক-খানি নৌকার উপরে কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়াইয়া অসহায়ের সাহায্যার্থে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে-ছিল। চাউল, বস্ত্র, চিপীটক প্রভৃতি তাহাদের নৌকায় যথেষ্ট

পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্যাদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার জন্য এবং মজ্জমান ব্যক্তিদিগকে জল-সমাধি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পুণ্যাধার সেবকবৃন্দ জলে জলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন সেবক ভাসমান রমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিল এবং তাহার উদ্ধারার্থ তাহারা একখানি নৌকা লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের উদারতায় রমেন্দ্র ও মনোরমা জলসমাধি হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

রমেন্দ্র ও মনোরমাকে স্বেচ্ছা-সেবকগণ যখন নৌকার উপর উঠাইল, তখন তাহাদের শরীর হিম-শীতল, নাসিকারন্ধ্রে আর শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না—তাহাদের জীবনের তখন আর কোনও লক্ষণই নাই। তাহাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডখানি অপসারিত করিতে যাইয়া সেবকগণ দেখিল,—সেখানি কাষ্ঠ নহে—কোনও অভাগার মৃতদেহ। সে দৃশ্যে সেবকগণের মধ্যে অনেকেরই দেহ কণ্টকিত হইল।

যাহা হউক, "শব-কাষ্ঠ" ফেলিয়া দিয়া তাহারা রমেন্দ্র ও মনোরমাকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কারণ, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"এখনও এ দেহ জীবনশূন্য নহে।" অন্যান্য সেবকগণ স্ব স্ব নৌকায় থাকিয়া—স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। সে সেবা অলৌকিক, অতুলনীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত যখন বুঝিল, রোদনে বা হা-হুতাশে কোনই ফল নাই, তখন সে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিল এবং লোকজন সংগ্রহ করিয়া নৌকারোহণে বন্ধুর অন্বেষণে বহির্গত হইল। নৌকা যখন "বাহির জলে" বাহির হইয়া যায়, তখন মনোরমার শোকসন্তপ্তা মাতা সত্যব্রতের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া কহিলেন—"দেখিস্ বাবা, আমার দুটীকেও যেন ফিরিয়ে আন্‌তে পারিস্।" "দুটী" অর্থে মনোরমা ও তাহার শিশু ভ্রাতা।

সত্যব্রত অশ্রুসিক্তনয়নে কহিল—"তা'ই আশীর্ব্বাদ কর মা, তা'ই যেন হয়। একজনের সন্ধান পেলেই হয়ত সকলকে পা'ব।" দ্রুতবেগে নৌকা দৃষ্টির বহিভূ́ত হইয়া গেল। শোকাতুরা জননী তখনও চীৎকার করিয়া সত্যব্রতের উদ্দেশে বলিতেছেন—"তা'দের ফিরিয়ে আনিস্ বাবা? বেলা অনেক হ'ল, এখনও তা'রা মুখে জল দেয় নাই।"

অভাগিনী এখন উন্মাদিনী। হরকুমার আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। হায়! প্রিয়জন-শোক! সে নিদারুণ শোকের বেদনা মানুষকে পাগল করিয়া দেয়!

নৌকারোহণে সত্যব্রত চতুর্দ্দিকে রমেন্দ্র ও মনোরমার অন্বেষণ করিল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে নানা কথা, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু

তাহার কোনও ফলই ফলিল না। জলবিস্তার তখন অসীম—অনন্ত; শবের সংখ্যা তখন অগণ্য—জীবন্মৃতের সংখ্যা গণনা করিবার উপায় নাই—স্রোতের টানে মৃত ও জীবন্ত সব ভাসিয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের উদ্যম ও চেষ্টায় অনেকেই মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রমেন্দ্র, মনোরমা বা তাহার শিশু ভ্রাতার সন্ধান পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কেমন করিয়াই বা সে সংবাদ পাওয়া যাইবে। দেশ তখন জলে জলময়—দিকে দিকে স্বেচ্ছা-সেবকগণ আপনাপন কর্ম্মে নিযুক্ত। সকল স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত সত্যব্রতের অবশ্য সাক্ষাৎ হয় নাই—তাহা হওয়াও সম্ভব নহে। সুতরাং রমেন্দ্র ও মনোরমার যে কি হইল, তাহারা কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, তাহারা এখনও জীবিত কি মৃত তাহা নিরূপণ করা কেমন করিয়া কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে?

সত্যব্রতের যখন মনে ধারণা হইল যে রমেন্দ্র ও মনোরমা অগাধ জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের উদ্ধার করা এক প্রকার সাধ্যাতীত, তখন সে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ করিতে লাগিল। এতক্ষণ তাহার আশা ছিল, রমেন্দ্র জীবিত আছে এবং সে কোথাও না কোথাও ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথবা কেহ না কেহ তাহাকে জল হইতে উঠাইয়াছে। রমেন্দ্র বিশেষ সন্তরণপটু। সে যে প্রান্তরের জলে সহসা ডুবিয়া যাইবে, এমন কথা সত্যব্রত কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারে নাই, অথবা সে কথা ভাবিতে

তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বহু চেষ্টা ও বহু অন্বেষণের ফলেও যখন তাহাকে পাওয়া গেল না, তখন সে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমেন্দ্রকিশোরের মত বন্ধু হারাইলে সত্যব্রতের আর কি থাকিবে, কি লইয়া সে আর সংসার করিবে! রমেন্দ্র তাহার পরামর্শে মন্ত্রী, আজ্ঞাপালনে দাসানুদাস, আজ্ঞাদানে প্রভু, স্নেহে সহোদর, নিরাশায় আশা, অন্ধকারে আলোক; সুখে, সম্পদে, দুঃখে, বিপদে রমেন্দ্র তাহার সর্ব্বস্ব, রমেন্দ্র তাহার জীবন, রমেন্দ্র তাহার প্রাণারাম; রমেন্দ্র ভিন্ন তাহার বাঁচিয়া সুখ নাই, বুঝি বা মরিয়াও শান্তি নাই। এমন বন্ধু হারাইয়া সত্যব্রত স্থির থাকিবে কেমন করিয়া? সত্যব্রতের আশা ভরসা যাহা কিছু ছিল, তাহা রমেন্দ্র; সুখ, শান্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা রমেন্দ্র; সম্পদ, গৌরব যাহা কিছু ছিল, তাহা রমেন্দ্র। তাহাদের পরস্পরের স্নেহ উদার অনন্ত; ভক্তি, বিশ্বাস অকৃত্রিম; বন্ধুত্ববন্ধন অলৌকিক। তেমন বন্ধু হারাইয়া—সত্যব্রতের মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

মৃতপ্রায় হইয়া সত্যব্রত নৌকার উপর পড়িয়া রহিল। নৌকাবাহিগণ ও নৌকাস্থিত অন্যান্য লোকজন সতর্কতার সহিত নৌকা চালাইয়া মিত্রবাটী অভিমুখে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না।

সত্যব্রতের এক ক্ষীণ আশা ছিল, রমেন্দ্র, হয়ত এতক্ষণ

ভাসিয়া ভাসিয়া বাটীতে আসিয়া পৌঁছাইয়া থাকিবে। সেই আশায় তাহার শরীরে অনেকটা বল আসিল। কিন্তু সে আশা বৃথা!

নৌকা যখন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, তখন সে স্থানের লক্ষণাদি দেখিয়া তাহাকে বুঝিতে হইল, তাহার আশা-প্রদীপ নিরাশার ঝঞ্ঝাবাতে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। সত্যব্রত নৌকা-মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িল—অন্যান্য সকলে ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেল। তখন সাবিত্রী সুন্দরী পা ছড়াইয়া বসিয়া শিশু পুত্রকে স্তন্য পান করাইবার অভিনয় করিতেছেন, আর বলিতেছেন—"রমা, ব'স মা, ব'স; খোকাকে খাইয়ে দাইয়ে তোকে ভাত্ দিচ্ছি মা, ব'স।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যখন সকল চেষ্টা বিফল হইল, সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল, সকল আশা নির্ম্মূল হইল, তখন সত্যব্রত আর বর্দ্ধমানে বৃথা কালক্ষেপ করিতে চাহিল না। সে স্থান তাহার পক্ষে তখন কারাপেক্ষাও ভীষণতর হইয়া উঠিল। অহিশেখর তাহার প্রতি সাতিশয় সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল এবং তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু সে মিষ্টালাপে বা সহানুভূতিতে তাহার মন আর মানা মানিল না, হৃদয় আর বেদনা মুক্ত হইল না। রমেন্দ্রময় সত্যব্রত রমেন্দ্রকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়াছে। সংসারের কোনও সুখ, কোনও সম্পদ, কোনও আশা তাহাকে যে কখনও আর আশান্বিত করিতে পারিবে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া তাহা আর মনে করিবার উপায় রহিল না। বিশেষ সাবিত্রীর ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, হাস্য, নৃত্য, অনুনয়, অনুরোধ এবং অন্যান্য প্রলাপবাক্য সত্যব্রতকে অধিকতর ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তুলিল। সন্তানশোক-সন্তপ্তা উন্মাদিনী জননীকে শান্ত করিবার চেষ্টা মনোরমার ধৈর্য্যশীল পিতা যথেষ্টই করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনও ফল ফলে নাই। উন্মাদিনীর উন্মত্ততা বরং তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছিল। সে শোকদৃশ্যে শোকাতুর সত্যব্রতের

শোকোচ্ছ্বাসও তটবিঘাতিনী প্রবাহিনী-বক্ষোপরি ফেনিল তরঙ্গমালার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সত্যব্রতের মনের অবস্থা বুঝিয়া অহিশেখরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। সত্যব্রতকে সে বাটীতে রাখা অহিশেখর আর কোনও প্রকারে সমীচিন বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তবে জলপ্লাবননিবন্ধন যে কয়দিবস বাটী হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব হইল, সেই কয়দিবস মাত্র অহিশেখর তাহাকে মৌখিক যত্ন দেখাইয়া বাটীতে স্থান দিল। বন্যার স্রোত হ্রাস হইতেই অহিশেখর সত্যব্রতের বাটী যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে সত্যব্রত যখন অহিশেখরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন সাবিত্রী-সুন্দরী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া হরকুমারের সম্মুখে অভিনব অঙ্গভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকে ছেড়ে দিলে যে?" হরকুমার বিস্মিত-নেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"কাকে?"

সাবিত্রীসুন্দরী সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া কহিল—"ওকে, ও যে ছেলে-চোর।" ব্যাকুল স্বামী উন্মাদিনী পত্নীকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"না, না ও তা' নয়, তা' নয়। ও সত্যব্রত, রমেন্দ্রের বন্ধু, ও আজ বাড়ী গেল। তুমি চল, ঘরে চল। এমন ক'রে বা'রবাড়ীতে স্ত্রীলোকের কি আসতে আছে।"

পাগলিনী উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—"যাও যাও, আমি

ঘরে যা'ব না; আমি বর দে'খ্‌ব, বর দে'খ্‌ব। রমার বর, রমার বর। আয় খোকা আয়—বর দেখ্‌বি আয়।"

সন্তানহারা জননী কল্পনায় সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করিল, কল্পনায় সন্তানের মুখ চুম্বন করিল, কল্পনায় সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া "রমার বর" দেখিতে ছুটিল। হরকুমার তাহাতে বাধা-প্রদান করিতে অগ্রসর হইলে সে বাধা অতিক্রম করিতে পাগলিনী বিশেষ চেষ্টা করিল।

সত্যব্রতকে একটু আগাইয়া দিয়া অহিশেখর বাটী প্রবেশ করিবার পথে সে দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অহিশেখরকে দেখিয়া হরকুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুযোগে উন্মাদিনী সাবিত্রী—"ধর্‌ ধর্‌ ছেলেধরা" বলিয়া ছুটিয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। অহিশেখর কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাটীর দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিল। হরকুমার তাঁহার পাগলিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ধরিতে ছুটিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্রকিশোরের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল—সম্পর্কে সে রমেন্দ্রের খুল্লতাত। তবে খুল্লতাত মহাশয়কে দত্তবাটীতে পূর্ব্বে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। অনেকে তাহার অনেক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

খুল্লতাতের নাম মধুসূদন ঘোষ। মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের পিতার দূর সম্পর্কীয় মাতুলপুত্র। বয়স তাহার অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বয়সের অনুপাতে নিতান্ত হীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধুসূদন দেখিতে যেরূপ কুৎসিত, তাহার মনও সেইরূপ কুৎসিত। তথাপি রমেন্দ্রকিশোরের স্বর্গগত পিতৃদেব তাহাকে সুপথগামী করিবার এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। উদার পুরুষের উদার চেষ্টার কিছু ফলও ফলিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিপরীত ফলও যে ফলে নাই, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। হীনবুদ্ধিসম্পন্ন পরশ্রীকাতর মধুসূদন দেবভাবাপন্ন মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। উদারহৃদয় সত্যেন্দ্রকিশোর তাহা বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কিন্তু তিনি মধুসূদনকে আর শাসনও করিতে পারিলেন না এবং তাহাকে তাঁহার আশ্রয় হইতে বঞ্চিতও করিতে পারিলেন না। স্বরোপিত বিষবৃক্ষের

উৎপাটিত করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। মধুসূদন সেই হিসাবে বাঁচিয়া গেল এবং তাহার জীবিকার্জ্জনের সে একটা বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল!

বহির্দৃষ্টিতে মধুসূদনকে কু-লোক বলিবার উপায় নাই। সে পূজাপাঠ করে, ভিক্ষার্থীকে দু' পয়সা ভিক্ষা দেয়, লোকজনের সহিত শিষ্টালাপ করে, আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণের বাটীতে যাইয়া বাটীর কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করে এবং অবসর মত সাহিত্যদর্শনাদির অনুশীলনও যে না করে, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণেই অনেকের ধারণা—মধুসূদন বড় মধুর প্রকৃতির লোক এবং সে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের পথিক।

বস্তুত সে সে প্রকৃতির লোক নহে! কাহারও শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিলে মধুসূদনের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আহারে রুচি থাকে না এবং তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। প্রতিষ্ঠাবানের বিপদ ও দারিদ্র্যের কথা অবগত হইলে সে আর্ত্তজনের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু মনে মনে যারপরনাই আনন্দানুভব করে। পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়,মধুসূদন তাহার সদাশয় আশ্রয়দাতা আত্মীয়েরও সর্ব্বনাশসাধনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মধুসূদনের উপযুক্ত পুত্র বিশ্বনাথও নাকি পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অন্য এক অধম ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিয়া রমেন্দ্রকিশোরের

৬

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রকিশোরকে একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় বিজড়িত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি বলিয়া সত্যেন্দ্রকিশোর সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

মধুসূদনের অনন্ত গুণ যখন অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন সে স্বয়ংই দত্ত বাটীতে যাতায়াত বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। সত্যেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে মধুসূদন মধ্যে মধ্যে বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু গৃহস্থ নিদ্রিত নহে বুঝিতে পারিয়া সে আর সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে নাই।

সেই মধুসূদন যখন শুনিল, রমেন্দ্রকিশোর বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং এতাবৎকাল তাহার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই, তখন তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তবে সে আনন্দ মনে মনে—বাহিরে তাহা আর ফুটিয়া বাহির হইল না।

রমেন্দ্রের শোকে মধুসূদন অনেক কাঁদিল, মৃতের গুণকীর্ত্তন করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল, শোকানলে তাহার হৃদয় যে ভস্মীভূত হইতেছে, সে কথা সে শতবার শতপ্রকারে সকল লোকের নিকটে অভিনয়ভঙ্গীতে বুঝাইয়া বলিল। তৎপরে সে পরমাত্মীয়ের মত রমেন্দ্রকিশোরের বাটী পরিদর্শনাদি করিবার সঙ্কল্প করিল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহার সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিল। বাটী পরিদর্শনাদির পরে সে সেই বাটীতেই তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করিল এবং সেইখানেই রহিয়া গেল। অবশেষে

একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, রমেন্দ্রকিশোরের লোহার সিন্ধুক হইতে একখানা উইলপত্র বাহির হইয়াছে। সেই উইলের বলে, মধুসূদন, রমেন্দ্রকিশোরের উত্তরাধিকারী এবং রমেন্দ্রের প্রভুত সম্পত্তি মধুসূদনেরই প্রাপ্য।

উইলের কথা শুনিয়া অনেকে হাসিল, অনেকে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তবে সে কথায় কেহ আর বিশেষ কোনও কথা কহিল না। রমেন্দ্রের বিষয় সম্পত্তিতে দাবী করিবার অন্য আর কেহই ছিল না; সুতরাং মধুসূদনের দাবীই বজায় রহিল। মধুসূদন তখন শিকড় গাড়িয়া রমেন্দ্রের বাটীতে বসিয়া পড়িয়াছে—অর্থ-বলে তাহার লোকবলও তখন যথেষ্ট। অতএব কোন্ ভদ্র-সন্তান আর তখন কথায় কথা বাড়াইয়া অভদ্রের সহিত অভদ্রতা করিতে অগ্রসর হইবে? পাপের তখন জয় হইল, পুণ্যের পরাজয় হইল। মধুসূদনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তখন আর কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। নির্ব্বিবাদে মধুসূদন রমেন্দ্র-কিশোরের সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে লাগিল।

সত্যব্রত সকল কথা শুনিল এবং শুনিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে বসিয়া অবিরলধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে অশ্রু, রমেন্দ্রের বিষয়-সম্পত্তি পরহস্তগত হইবার জন্য নহে—রমেন্দ্রের বিরহে। সত্যব্রতের তখন মর্ম্মদাহ হইতেছে; সত্যব্রত তখন রমেন্দ্রকিশোরের চিন্তায় বিভোর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অহিশেখর বৰ্দ্ধমানে বসিয়া মধুসূদনের বিষয়াধিকারের কথা শুনিল। সে কথা শুনিয়া সে অবশ্য স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার স্বর্গগতা ভ্রাতৃজায়া—রমেন্দ্রের পিসীমাতা শিবসুন্দরীর কিছু তৈজসপত্র, কিছু অর্থালঙ্কার, কিছু বহুমূল্য বস্ত্র রমেন্দ্রকিশোরের নিকট গচ্ছিত হইল। গচ্ছিত ধন শিবসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে অবশ্য রমেন্দ্রকিশোরেরই প্রাপ্য। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোর যখন জীবিত নাই, তখন কোন্ অধিকারে প্রবঞ্চক মধুসূদন তাহা গ্রহণ করে? রমেন্দ্রকিশোর যে উইল করিয়া যায় নাই, সে কথা অন্য সকলেও যেমন বুঝিয়াছিল, অহিশেখরও সেইরূপ বুঝিল। মধুসূদন যে একখানা জাল-উইলের বলে রমেন্দ্রকিশোরের অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, তাহা অহিশেখর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু সহ্য না করিয়াই বা আর উপায় কি? সকলেই সকল কথা যে না বুঝিয়াছিল, এমন নহে; তবে দুর্ব্বৃত্ত মধুসূদনের বিরুদ্ধে যে কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই, তাহার কারণ রমেন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া আর কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় নাই।

উপায়ান্তর না দেখিয়া অহিশেখর তখন ভাবিতে লাগিল,—উইলের শক্তিতেই হউক, আর উত্তরাধিকারসূত্রেই হউক, মধুসূদন যদি কেবলমাত্র রমেন্দ্রকিশোরের সম্পত্তির অধিকারী

হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু অহিশেখর যখন জীবিত, তখন তাহার ভ্রাতৃজায়ার অর্থালঙ্কারাদি তাহার হস্তচ্যুত হইবে কেন?

সে সমস্ত অর্থালঙ্কারাদি ফিরিয়া পাইবার আশায় অহিশেখর উপায় চিন্তা করিতে লাগিল এবং সে সম্বন্ধে মধুসূদনের নিকট একখানা পত্রও প্রেরণ করিল। মধুসূদন কিন্তু প্রথমে সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কিন্তু যখন সে বুঝিল, অহিশেখর কোনও অংশে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ব্যক্তি নহে, তখন মধুসূদন বিনয়নম্র পত্রোত্তরে লিখিল—"শিবসুন্দরীর অর্থ ও অলঙ্কারের কথা সে বস্তুতই অবগত নহে এবং উল্লিখিত অর্থালঙ্কারাদি তাহার নূতন অধিকৃত বাটীর কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে না এবং তাহা পাইবারও সম্ভাবনা নাই।"

অহিশেখরও ছাড়িবার পাত্র নহে। বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারসাধনে সে বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিল। উদ্যোগপর্ব্বের ঘটা দেখিয়া মধুসূদন বুঝিল, অহিশেখর আদৌ সরল বা কোমলপ্রকৃতির লোক নহে। সুতরাং তাহার সহিত বাদ-বিষম্বাদ করা মধুসূদনের পক্ষে খুব সহজ হইবে না। আর অহিশেখরের যেরূপ অভিযোগ, তাহার বিচারফলে যে মধুসূদনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বিচারালয়ে প্রকাশ পাইবে—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে, সে কথা বুঝিতেও মধুসূদনের বাকী রহিল না। অগত্যা মধুসূদন অহিশেখরের

সহিত একটা “মিট্‌মাট্‌” করিতে বাধ্য হইল এবং শিবসুন্দরীর পরিত্যক্ত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি মিত্রবাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিল।

অহিশেখর মনে মনে হাসিয়া শিবসুন্দরীর সম্পত্তি গ্রহণান্তর আর একটা নূতন চাল চালিল। ভয়ে তখন অহিশেখরের প্রতি মধুসূদনের প্রবল ভক্তি হইয়াছে। সে সহজেই স্বীকার করিল, রমেন্দ্রকিশোরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অহিশেখরের একটা অংশ থাকিবে। মধুসূদন প্রবঞ্চক—কাপুরুষ। চতুর অহিশেখরের চাতুরীর কথা বুঝিতে পারিয়াও সে আর তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিতে পারিল না। কারণ তাহাতে মধুসূদনের বিপদ-পাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বিষয়সম্পত্তির অংশবিভাগের কথা যখন স্থির হইয়া গেল, তখন মিত্রজ ঘোষজর বন্ধু হইয়া পড়িল। সে বন্ধুত্ব অবশ্যই মৌখিক। যাহা হউক, তাহাতে কোনও পক্ষেরই বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না। তখন চতুরতা চলিতে লাগিল—চতুরে চতুরে।

অ-লাভ হইল মনোরমার পিতা হরকুমারের। অহিশেখর ও মধুসূদনের বিষয়াধিকারের কথা শুনিয়া হরকুমার অহিশেখরকে দুই পাঁচ কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে হরকুমারকে বর্দ্ধমান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। উন্মাদিনী সাবিত্রী সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন—তখন তিনি নিরাশ্রয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যাঁহাদের সদাশয়তায় রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার চেতনা-বিহীন দেহ জলরাশি হইতে নিরাপদ স্থলে আনীত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কালীঘাটের সেই পূর্ব্বকথিত বিমলানন্দ ভারতী ও তাঁহার শিষ্য নবীনানন্দকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জলপ্লাবনে লোকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া হৃদয়বান বিমলানন্দ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। সেবাধর্ম্মে তাঁহার প্রবল আস্থা। আর্ত্তগণের জন্যই তিনি কালীঘাট হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপন্নদিগের সেবা করিতেছিলেন। নবীনানন্দও তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিল। বিমলানন্দ ও নবীনানন্দের সেবা ও যত্নে যে সে যাত্রা অনেকেরই জীবন রক্ষা হইয়াছিল—এ কথা বলিলে তাহা অতিরঞ্জিত হইবে না। বিমলানন্দকে সাহায্য করিবার জন্য বিস্তর লোক ভারতীর দলে যোগদান করিয়াছিল। সেই কারণে সেবাকার্য্যে বিমলানন্দের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমাকে যখন জল হইতে উঠান হইয়াছিল, তখন যে তাহাদের সংজ্ঞা ছিল না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাদিগকে স্থানান্তরে—একটী উচ্চভূমিস্থিত কুটীরে লইয়া যাইয়া উদ্ধারকর্ত্তা তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং ঔষধ

প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হইল। অগ্নির তাপে এবং ঔষধের গুণে মুমূর্ষুদ্বয় জীবন ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে তাহাদের কিছুকাল কাটিয়া গেল। সেই সময়ের মধ্যে মধুসূদন রমেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তি অধিকার করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং অহিশেখরও চতুরতাগুণে সে বিষয়সম্পত্তিতে কিছু ভাগ বসাইয়াছে।

মনোরমার যখন প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিল, সে একটী মলিন শয্যায় শায়িতা এবং অদূরে আর একটী শয্যায় তাহার জীবনরক্ষক শয়ন করিয়া আছে। তাহারা যে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, সে কথা মনোরমা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই জলোচ্ছ্বাস, জলতরঙ্গ তাহার মনে তখনও জাগিতেছিল। মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদ স্থলে অবস্থান এবং শয্যা ও সুশ্রূষার ব্যবস্থা দেখিয়া সে প্রথমে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং তৎপরে জীবনদাতার উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিল। বিমলানন্দ এবং তাঁহার শিষ্য নবীনানন্দ যে তাহাদের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে কথা সে আদৌ অবগত ছিল না। মনোরমা জানিত, রমেন্দ্রকিশোরই তাহার রক্ষাকর্ত্তা এবং রমেন্দ্রই তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া আসিয়াছে।

চারি পাঁচ দিনের পর মনোরমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে এখনও বড় দুর্ব্বল—তাহার শরীরে দারুণ বেদনা—উত্থান-

শক্তি আদৌ নাই। নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া সে বাটীর কথা, পিতা-মাতার কথা, শিশু-ভ্রাতাটীর কথা, ভীষণ বন্যার কথা ভাবিতে লাগিল।

বাটীর কথা মনে পড়িতেই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, তাহার নেত্রযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদে কুটীর তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলানন্দ আসিয়া মনোরমাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবীনানন্দও ভারতীর সঙ্গে ছিল—তবে একটু দূরে দূরে।

অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে সেই স্থানে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনোরমার ক্রন্দন ইতঃপূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছিল। বিমলানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কাঁদ কেন মা, ভয় কিসের? অচিরেই আমি তোমাকে তোমাদের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিব। একটু সুস্থ হও মা,—তা'রপর আমি সকল ব্যবস্থা ক'রবার অবসর পা'ব!"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মনোরমা সন্ন্যাসীর সহানুভূতিসূচক কথায় কোনও উত্তরই করিতে পারিল না। ঔদাসীন্যবশতঃ সে সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া নবীনানন্দ একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছিল। তাহার মনের ভাব—জীবনরক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকল সময়েই বিধেয়। বিশেষ জীবনদাতা যখন সংসারত্যাগী—সন্ন্যাসী। নবীনানন্দ আরও ভাবিল,—যখন তাহার সম্মুখে তাহার গুরুদেব

যথোচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই, তখন স্থানত্যাগ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছিল। বিমলানন্দ শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া কহিলেন—

"অসহায় অবস্থায় পতিত প্রাণীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করা হীনতা অথবা বাতুলতার লক্ষণ। আর একটা কথা—তুমি আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা কর ব'লেই যে সকলকে তা' ক'র্‌তে হ'বে, এমন বিধিনিয়ম ত কিছু নাই। সন্ন্যাসীর আবার পদই বা কি, আর মর্য্যাদাই বা কি? ভগবানে আত্মসমর্পণ যা'র ধর্ম্ম, তা'র নিকট আবার ক্ষুদ্র, মহৎ কি? কথাটা বুঝ্‌লে কি বাবা?"

গুরুদেবের শাসন-ইঙ্গিতে অপরিণতবয়স্ক শিষ্যের সে মনোভাব অপনোদিত হইল এবং তাহার বুদ্ধিহীনতা এবং অনভিজ্ঞতার জন্য সে অতিমাত্র অপ্রতিভ হইল। গুরুদেবের মিষ্টবাক্যে শিষ্যের সে অপ্রতিভ ভাব অবশ্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। নবীনানন্দ ভাবিল—সে দিন তাহার বৃথায় যায় নাই—কারণ সেদিন গুরুদেবের নিকট হইতে সে কিছু উপদেশ লাভ করিয়াছে।

গুরু ও শিষ্যের কথাবার্ত্তা শ্রবণানন্তর সদ্য চৈতন্যপ্রাপ্তা মনোরমা যেন কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কোনও কথা, কোনও বিষয় সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তবে তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার কথা লইয়া একটা গোলযোগ বাধিয়াছে এবং একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। দারুণ কাতরতার

সহিত সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসী-দ্বয়কে অভিবাদন করিবার উদ্দেশ্যে করযোড় করিল। বিমলানন্দ হাসিয়া বলিলেন—

"আমাদের ব্যবহারে তোমার প্রাণে আঘাত লাগিবারই কথা মা। যা "হ'ক, তুমি অচিরে সুস্থ হও, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

রমেন্দ্রকিশোরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন—

"উনিও শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবেন। উভয়ের আরোগ্য লাভের নিমিত্ত আমি অহর্নিশি ভগবৎসমীপে প্রার্থনা কচ্ছি।"

বিমলানন্দের কথায় যে মনোরমা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল। কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নয়নে সে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল, আর একবার রমেন্দ্রকিশোরের দিকে চাহিল। তৎপরে সে তাহার যুক্তকর আপন বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে কাহার উদ্দেশে যে কত কথাই বলিতে লাগিল, তাহার স্থিরতা নাই।

সুন্দরী মনোরমার তৎকালীন মুখভাব অতি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা অবলোকন করিয়া বিমলানন্দ অনন্ত সৌন্দর্য্য-রচয়িতা অনন্তদেবের চিন্তার ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। নবীনা-নন্দ তখন কুটীরের বর্হির্দ্দেশে বসিয়া মুক্তাকাশ দেখিতে দেখিতে গায়িতেছে——

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততো বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অহিশেখর মিত্রের সহায়তায়, বিষয়কার্য্য পরিচালনায় মধুসূদনের অনেকটা সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অসুবিধাও যে না ঘটিল, এমন কথা বলা যায় না। বিষয় সম্পত্তি মধুসূদনের কোনও কালেই ছিল না, সুতরাং তাহাকে বিষয় কার্য্যও করিতে হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বিষয়কার্য্যে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না! অগত্যা তাহাকে অহিশেখরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। অহিশেখর যে কিরূপ সুচতুর ও স্বার্থপর ব্যক্তি তাহা মধুসূদনের বুঝিতে বাকী ছিল না। কিন্তু অহিশেখরের বুদ্ধি ব্যতীত তাহার বিষয় রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। এরূপস্থলে অহিশেখরের কুটীলতা বুঝিতে পারিয়াও পরস্বাপহারক মধুসূদনকে চুপ্ করিয়া থাকিতে হইল।

অহিশেখর যে নিতান্ত হীন প্রকৃতির লোক, তাহা বলা ঠিক হয় না। তবে প্রবল স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থপরতা তাহাকে হীনতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—সুতরাং অভাগার আর অপরাধ কি? অপরাধ বোধ হয় বিধাতার। সমস্ত দোষটা বিধাতা পুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া অহিশেখর তখন নিশ্চিন্ত মনে পরের সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইল। হায় যুক্তি!

পূর্ব্বাবধিই সে রমেন্দ্রকিশোরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। রমেন্দ্রের প্রতি তাহার ভ্রাতৃজায়ার অত্যধিক স্নেহ মমতাই এ

ঈর্ষার মূল কারণ। উপায়ন্তর ছিল না বলিয়াই এ ঈর্ষা এতদিন ফুটিতে পায় নাই। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন অহিশেখর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে রমেন্দ্রের সহিত সম্মুখ-সমরে তাহার জয়ের সম্ভাবনা নাই—অধিকন্তু লোকসমাজে এবং তাহার ধনাঢ্যা ভ্রাতৃজায়ার চক্ষে তাহাকে ঘৃণ্য হইতে হইবে। তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন তাহার লাভের আশা ছিল না। কাজে কাজেই তাহাকে দায়ে পড়িয়া শিষ্ট শান্ত হইতে হইয়াছিল! সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া সে আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইল। পথ নির্ব্বাচনে এবং করণীয় নির্দ্ধারণে তাহার একটা বিশেষ সুবিধা হইল। রমেন্দ্রকিশোর তখন তাহার চক্ষে মৃত—ইহা অহিশেখরের পক্ষে বড় অল্প সুবিধার কথা নহে। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য আপন মনে সে আপনি ভাবিতে লাগিল—রমেন্দ্রকিশোর যদি বাঁচিয়া থাকিত সেও বরং এক কথা ছিল। কিন্তু "পর" মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়-সম্পত্তি একা একা ভোগ করে কোন্ অধিকারে?

তত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া অহিশেখর বিশেষ গোলে পড়িল। উর্ণনাভের মত আপনার জালে সে আপনি আবদ্ধ হইল। অদৃষ্ট দেবী অদৃশ্যা থাকিয়া তাঁহার চক্র ঘুরাইতে লাগিলেন। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হইয়া গেল। রহিল মাত্র তাহার কলঙ্ক—আর রহিল মাত্র তাহার কলঙ্কের ঘোষণা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কলঙ্কিত অহিশেখর অনুমান করিল, তাহার কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে রমেন্দ্রকিশোরের বন্ধু সত্যব্রত। তাহার এরূপ অনুমান করিবার কারণ, সত্যব্রত তাহার গৃহে হরকুমার ও সাবিত্রী সুন্দরীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। অহিশেখর আবার মনে মনে যুক্তিতর্ক করিল—সে যাহাদের আশ্রয় চ্যুত করিয়াছে, সত্যব্রত তাহাদের স্থান দিবার কে এবং আশ্রয় প্রদান করেই বা কোন্ সাহসে ?

সাহসিকতায় নির্ভর করিয়া অবশ্য সত্যব্রত আশ্রিতদিগকে আশ্রয় প্রদান করে নাই, অথবা অহিশেখরের কলঙ্ক রটনা করে নাই। সে যাহা করিয়াছিল, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে। মধুসূদন ও অহিশেখর কিন্তু সে অনুরোধ মানিবার লোক নহে। সে অনুরোধ তাহারা মানিলও না। তাহারা বরং পরামর্শ করিয়া সত্যব্রত ও তাহার আশ্রিতগণকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কথা অবগত হইয়া সত্যব্রত একটু হাসিল। হরকুমার কিন্তু চিন্তিত হইয়া পড়িল। উদ্বেগের কারণ রহিল না কেবল মনোরমার মাতা সাবিত্রী-সুন্দরীর। সে উন্মাদিনী। তাহার উন্মত্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষাগুণে মনোরমা সারিয়া উঠিল এবং রমেন্দ্রকিশোরও আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। সেবকগণের মধ্যে অনেকেই ভাবিয়াছিল, রমেন্দ্রকিশোরের জীবন রক্ষা আর বুঝি হইল না। কিন্তু করুণাময়ের করুণ বিধানে সে যাত্রা সে রক্ষা পাইল। তবে সে বড় দুর্ব্বল, বড় অবসন্ন, বড় চিন্তাভার-ক্লিষ্ট। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীরে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। মলিন-শয্যায় শয়ান থাকায় তাহাকে অধিকতর মলিন দেখাইতেছিল।

যাহা হউক, মনোরমা ভাবিল, রমেন্দ্রকিশোর যে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। সে স্থানে, সে অবস্থায় ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শয্যা আর পাওয়া যাইবে কোথায়? পীড়িতের শয্যা ও আশ্রয়স্থান যে তেমন দুর্দ্দিনেও পাওয়া গিয়াছিল, ইহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। সেবকদলের সাহায্য না পাইলে তাহাদের মৃত্যু যে অনিবার্য্য হইত, সে কথা বুঝিতে অবশ্য কাহারই বাকী রহিল না!

প্রান্তরের জল এখন শুকাইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে বপন কার্য্যাদিও আরম্ভ হইয়াছে। তবে দুর্দ্দিনের স্মৃতি, প্রকৃতির কলঙ্ক জনপদ হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। তৃণহীন, বৃক্ষহীন, শস্যহীন নগ্ন প্রান্তর; ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন, ভূমিসাৎ প্রাসাদ কুটীর;

প্রাণহীন, শব্দহীন লোকালয়, রৌদ্রদীপ্ত দিবাভাগে ও জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীতে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতি সুন্দরীর করুণাও যেরূপ, নির্দ্দয়তাও সেইরূপ। দেশে দেশে এখন অন্নকষ্ট, রোগকষ্ট, মৃত্যুবিভীষিকা—হাহাকার। সে যাতনা, সে বেদনা সে হতাশ ও হুতাশের রাগিণী শ্রবণে হৃদয়বানের বধির হইতে ইচ্ছা হয়, ভগবান্‌কে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিধাতার অখণ্ড বিধান অবোধ্য। রাজরাজেশ্বরের কাঠিন্যের মধ্যে কি করুণা, জ্ঞান-বাপীর গভীর তলদেশে কি অসীম জ্ঞান, অনন্ত দেবের অনন্ত প্রকৃতিতে কি অনন্ত লীলা—সৃষ্টিরাজ্যে ক্ষুদ্র কীট আমরা, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিব কিরূপে?

আর্ত্তের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া বিমলানন্দ ও তাঁহার শিষ্য-সেবকগণ অনেক সময়েই দূর দূরান্তরে অবস্থান করেন। রমেন্দ্র-কিশোর ও মনোরমাকে দেখিতে আশা এখন প্রায় তাঁহাদের আর ঘটিয়া উঠে না। প্রবীণ কুটীরস্বামীর উপর কিশোর ও কিশোরীর ভারার্পণ করিয়া বিমলানন্দ কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সেবাকার্য্য যাহাতে অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নবীনানন্দ মধ্যে মধ্যে আসিয়া কুটীরস্বামীর নিকট হইতে রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার সংবাদ লইয়া যায় এবং সেই সংবাদ বিমলানন্দের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। সে কুটীরমধ্যে আর প্রবেশ করে না। কুটিরস্বামীই এখন তাহার সংবাদদাতা। কে জানে ইহা কি রহস্য!

জাতিহিসাবে কুটীরস্বামী বৈষ্ণব, তাহার নাম কিশোরীদাস। কিশোরী দাসের ত্রিকুলে কেহই নাই। সম্বলের মধ্যে তাহার ছিল এক শতচ্ছিদ্র কম্বল, আর একযুবতী বৈষ্ণবী। কিন্তু বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবচূড়ামণির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চাতক পক্ষিণীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক শূন্যে শূন্যে ভ্রাম্যমানা হইয়াছে। কিশোরীদাসের এখন সম্বলমাত্র সেই ছিন্ন কম্বল, আর সেই ভগ্ন কুটীর। ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা—দ্বারে দ্বারে রূপমোহ হইতে এক্ষণে সে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ভিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে এতদিনে হয়ত সে রূপোন্মাদ হইয়া যাইত। একথা সে মুক্তকণ্ঠে বিমলানন্দের নিকট স্বীকার করিয়াছিল। বিমলানন্দ সেকথা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিলে ভগবতী স্বয়ং বৈষ্ণবী-রূপে বৈষ্ণবের প্রীতিবর্দ্ধন করিবেন এবং তাহার আহারাদির সুচারু ব্যবস্থা করিতেও বিস্মৃতা হইবেন না। সাধনমার্গের কথায় কিশোরীদাস আস্থাবান্ হইতে পারিয়াছিল কি না, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় নাই; তবে রাজভোগ ও বৈষ্ণবী প্রাপ্তির আশায় সে যে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখ ও নয়নের ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

সেই অবধি কিশোরীদাস মনোরমার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বিমলানন্দের কথায় সে বুঝিয়াছিল—সেই বালিকাই বুঝি ভগবতীর প্রীত্যর্থে আসিয়া দেবীরূপ লুকাইয়া এইরূপে

তাহাকে দেখা দিয়াছে। তবে রাজভোগটা যে তাহার কিরূপে সংগৃহীত হইবে, বহুচিন্তা করিয়াও সে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। অনন্যোপায় হইয়া সে স্থির করিয়া লইল যে, বালিকার সঙ্গে যে পুরুষটী ভাসিয়া আসিয়াছে, সে কোনও দেশের রাজা বা রাজকুমার হইবে। কালে যে তাহার রাজভোগের অভাব হইবে না, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিল। সে ভাবিতে লাগিল, ঐ যুবক যদি কোনও দেশের রাজা না হইয়া ভগবতীর আত্মীয়স্বজন হয়, তাহা হইলে উপায়? আর এমনও ত হইতে পারে যে, সুস্থ হইলে যুবক, যুবতীকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিবে এবং বিবাহান্তে তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে। এইবার চিন্তাটা তাহার কিছু গাঢ় হইল। সে চিন্তার ফলে কিশোরী দাসের মস্তক ঘুরিয়া গেল।

কিন্তু আশার মোহিনীশক্তি আছে। সে আবার ভাবিতে লাগিল—তেমনটা হইবে কেন? ভগবতী যখন তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, তখন কি আর কোনও প্রকারে অসুবিধা হইতে পারে! সকল দিকে সুবিধাই হইবে।

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও কিশোরীদাস শান্তি পাইল না। তাহার ভাবনা হইল—যদি এই যুবক, যুবতীকে বিবাহ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত তাহার সমূহ বিপদ। সে তখন খঞ্জনী বাজাইয়া একবার বিপদ্‌বারণ মধুসূদনের নাম করিয়া লইল।

তখন আশার কুহকে সে আবার ভাবিতে লাগিল—ও সকল দুশ্চিন্তা মাত্র। জলস্রোতে তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় আদৌ নাই। সামান্য যে পরিচয় টুকু তাহাদের মধ্যে হইয়াছে, তাহা একত্র বাসজনিত। সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে রাজকুমার নিশ্চয়ই আপন রাজ্যে চলিয়া যাইবে, আর অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা বৈষ্ণবীর "ভেক" গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসেবায় প্রাণ-মন উৎসর্গ করিবে।

কিন্তু কল্পনা-সুখেও তাহার বাধা পড়িল। কিশোরীদাসের পূর্ব্বসঙ্গিনী বৈষ্ণবরাণীর অভদ্র ব্যবহার ও পলায়ন-কাহিনী তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীর পলায়ন ব্যাপার বহুদিনের কথা নহে। ক্ষতচিহ্ন বৈষ্ণবের হৃদয় হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। সে কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে শূন্যনেত্রে শূন্যপথে চাহিয়া রহিল। আশা-বাণী, আশা-মন্ত্র আবার তাহাকে আশান্বিত করিয়া তুলিল। সে ভাবিল—ভয় কি, সন্ন্যাসী যখন বর দিয়াছে, তখন বৈষ্ণবী নিশ্চয়ই মিলিবে।

কিশোরীদাস সেই অবধি মনোরমার পদে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল। মনোরমার প্রীত্যর্থে সে এখন সকলই করিতে পারে। তাহার সোহাগের সামগ্রীর প্রীতি-সাধনে যত্নবান্ হইয়া সে ভিক্ষাবৃত্তিও ত্যাগ করিল। আর সে সময়ে ভিক্ষাই বা দেয় কে? তখন সর্ব্বত্র অন্নকষ্ট, সর্ব্বত্র হাহাকার। তবে বিমলা-

নন্দের আশ্রিতবর্গের মধ্যে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় নাই। অমানুষিক পরিশ্রম ও উদ্যমবলে বিমলানন্দ অন্ন সংস্থান করিয়াছিলেন প্রচুর। তাহাতে আশ্রিতগণের কোনও কষ্টই হইল না। কিশোরীদাস ভাবিল—ইহাই বোধহয় রাজভোগ।

যাহা হউক লুব্ধ কিশোরীদাস পাপ অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়াও মনোরমা ও রমেন্দ্রকিশোরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সে কার্য্যটা সে করিত—সন্ন্যাসীর ভয়ে। আর সন্ন্যাসীর তরুণবয়স্ক শিষ্য নবীনানন্দেরও সে দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সেই শাসনেই কিশোরীদাস উদ্ধত ও অত্যাচারী হইতে সাহস করে নাই।

মনোরমা কিন্তু কিশোরীদাসের মনোভাব বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে নাই। সে সরলান্তঃকরণে কিশোরীদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং অবসর মত তাহাকে এক আধটা গীত গাহিতে বলিত। কিশোরীদাস তখন খঞ্জনীতে তাল দিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভাঙ্গা গলায় গাহিত—

"আমা বিনা রাই জানে না।
আমা ছাড়া সেত বাঁচে না॥
এ মুরলী যদি বাজে বনমাঝে
সে কি আর থাকে ছার গৃহকাজে
ছাই দিয়ে লাজে
সকালে ও সাঁজে

না এসে থাকিতে পারে না।
সে ত কা'র মানা আর মানে না॥"

সে আবার গাহিত—

"কালো বড় ভালবাসে রাই।
ত্রিলোকে কালোর তুলনা নাই॥"

এই দুইটি চরণ গাহিয়াই সে আপনার নিভাঁজ কাল অঙ্গের প্রতি সোৎসাহে দৃষ্টিপাত করিত। সে ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনোরমা না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। সেই হাসি ও সেই মাধুরী দেখিয়া কিশোরীদাস খঞ্জনীতে দ্রুতলয় দিয়া পূর্ণ উদ্যমে গাহিত—

"ও রূপ গো কালো নয়,
ও কালো যে আলোময়—
কালোতে মজেছে সখী বুঝে সুঝে তাই,
কালো ভজ, কালো ভজ, কালাকাল নাই।"

এই সময়ে কিশোরীদাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া গীতিচ্ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিত এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া হৃদয়-বেদনা বুঝাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে কিশোরী-দাসের এত যত্ন, এত উদ্যম, সে ইহার কিছুই বুঝিত না, কিংবা বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করিত না। কিশোরীদাস হাস্যোদ্দীপক অঙ্গচালনা করিলে সে অবশ্য হাসি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু হাসির মধ্যেও মনোরমার হৃদয়ে চিন্তা-জ্বর

লুক্কায়িত থাকিত। তাহার চিন্তা, কবে রমেন্দ্রকিশোর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবে।

মনোরমার কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শুনিলেন। রমেন্দ্রকিশোর অচিরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে একদা বাটী প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিল। বিমলানন্দ সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন—

"বাটী যা'বে বৈকি বৎস। সুস্থ হও—পরে যথাবিহিত ব্যবস্থা হ'বে। কেন বৎস, এখানে কি তোমার তেমন যত্ন হয় না?"

সে সকল কথার উত্তরে রমেন্দ্রকিশোর আর কোনও কথাই কহিল না। সে বুঝিয়াছিল—তাহার জীবনদাতা কে। জীবন-দাতার কথার উপর সে আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। রমেন্দ্রকিশোর যখন বুঝিল, তাহার বাটী যাওয়ার বিলম্ব ঘটিবে, তখন সে অন্য উপায় স্থির করিল। মনোরমাকে ডাকিয়া রমেন্দ্র কহিল,—"আমি ত এখনও উত্থানশক্তিরহিত। তুমি একখানা পত্র আমার বাটীতে লিখে দাও। আর একখানা পত্র সত্যব্রতের নিকট পাঠাও। পত্র অবশ্য আমার নামেই লিখা হ'বে। চিঠি লেখা তোমার অভ্যাস আছে ত?"

রমেন্দ্রকিশোরের প্রশ্নে মনোরমার গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। যাহা হউক তথাপি সে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল, লেখাপড়ায় তাহার অভ্যাস আছে।

কিন্তু লেখা হইবে কিরূপে? কালী, কলম্, কাগজ কিছুইত সেস্থলে নাই এবং পাওয়াও সম্ভব নহে। অতএব পত্র লেখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিমলানন্দ কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, নবীনানন্দও আর বড় সেস্থানে আসে না। এরূপ ক্ষেত্রে মসী ও লেখনী প্রভৃতি সংগ্রহ করা যায় কিরূপে?

নবীনানন্দকে রমেন্দ্রকিশোর আদৌ প্রত্যক্ষ করে নাই। সে যখন অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, নবীনানন্দ নাকি তখন মনোরমার নিকটে নিকটে থাকিত। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের জ্ঞানলাভের পর হইতেই সেস্থানে আসা তাহার এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন একটু দূরে দূরে থাকে, দূরে দূরে গান গাহিয়া বেড়ায়, দূরে দূরে থাকিয়াই সে রমেন্দ্রকিশোরের কুশলসংবাদ গ্রহণ করে। তবে কিশোরীদাসের প্রতি সে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছে। বিমলানন্দের এইরূপই আদেশ। যাহা হউক, সে সকল কথা রমেন্দ্রকিশোর মনোরমা কিংবা কিশোরীদাস কেহই বুঝিতে পারে নাই, রমেন্দ্রকিশোর সেই কারণেই কহিল—"একবার তা'কে ডাক না। তা'কে একবার দেখি, আর কাগজ কলম যা'তে যোগাড় হ'তে পারে সে বিষয়েও তাকে অনুরোধ করিও।"

কিন্তু নবীনানন্দ তখন কোথায়? তাহার সন্ধান করিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। সে বিলম্ব মনোরমা সহ্য করিতে পারিল না। কিশোরীদাসকে অনুনয়, বিনয় করিয়া

কাগজপত্র লেখনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে বলিল। অন্য কেহ সেরূপ অনুরোধ করিলে সে সকল কথা কিশোরীদাসের কর্ণে স্থান পাইত কি না সন্দেহ; কিন্তু মনোরমার আজ্ঞা সে অবনত-মস্তকে পালন করিল। গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরিয়া লিখন-দ্রব্যগুলি যখন সে সংগ্রহ করিল, তখন সে পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল, এ দ্রব্যগুলি পাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ বৈষ্ণবী হয়ত তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিবে এবং একান্তই তাহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিবে। কল্পনাবলেই সে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

লেখনী প্রভৃতি মনোরমার হস্তগত হইলে মনোরমা অবশ্য কিশোরীদাসকে ধন্যবাদও প্রদান করে নাই, কিংবা আপনার জন বলিয়াও তাহার সহিত আত্মীয়তা করে নাই। কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির পর সুন্দরীর মুখে যে সরল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই লুব্ধ কিশোরীদাস কৃতার্থ হইয়াছিল।

রমেন্দ্রকিশোর পত্রের ভাষা বলিয়া যাইতে লাগিল, মনোরমা অতিকষ্টে তাহা লিপিবদ্ধ করিল। লিপিকুশলতায় মনোরমার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল না। তবে যে সে পত্র লিখিতে স্বীকার করিয়াছিল, তাহা কেবল রমেন্দ্রকিশোরের তুষ্টি সাধনার্থ। যাহা হউক, অনেক কাটিয়া কুটিয়া কালী ফেলিয়া মনোরমা পত্র দুইখানি কোনরূপে শেষ করিল। ডাকটিকিট কোথায় পাওয়া

যাইবে, এইবার সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল। টিকিটের অভাবে পত্র বেয়ারিং হইয়া গেল। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়া কিশোরীদাস পত্রখানি ডাকঘরের ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। তাহাও অবশ্য সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার লোভে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মনোরমার পিতা হরকুমারের কথা লইয়া সত্যব্রতের সহিত অহিশেখর মিত্রের তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। অহিশেখর বলে—হরকুমার কৃতঘ্ন, পামর, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। অন্ততঃ অহিশেখরের অনুরোধ, উপরোধ রক্ষা করাও সত্যব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্য। হরকুমারের কথা—অহিশেখরের নিকটে তিনি কোনও রূপেই দোষী নহেন এবং কৃতঘ্ন হইবারও তাঁহার কারণ ঘটে নাই। তিনি আরও বলিয়া থাকেন—অহিশেখর তাঁহার জ্ঞাতি হইলেও জ্ঞাতির নিকটে তিনি আদৌ উপকৃত নহেন। বরং জ্ঞাতি-শত্রুতা বশে অহিশেখর অনেক সময়ে তাঁহার অনিষ্টই করিয়াছে। তবে তাঁহার কন্যার সহিত রমেন্দ্রকিশোরের বিবাহ প্রস্তাব হওয়া অবধি অহিশেখর কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার নিরুদ্দেশ সংবাদ প্রাপ্তির পরেই সে আবার পূর্ব্বের মত অত্যাচারী হইয়া উঠিল।

জলপ্লাবনের সময় অহিশেখর তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে গৃহে স্থান দিয়া বিস্তর উপকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু মধুসূদনের পরামর্শে অহিশেখর রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইলে—অথবা এমনত বলা যাইতে পারে যে, অহি-শেখরের সাহায্যে মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়সম্পত্তি হস্তগত

করিলে—দুঃস্থ জ্ঞাতি হরকুমার তাহাতে বহু বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন এবং যাহাতে অহিশেখর সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে বিষয়েও তাহাকে বিস্তর অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হরকুমারের সহিত অহিশেখরের বিষম মনোমালিন্য ঘটে এবং হরকুমারকে আশ্রয়হীন হইতে হয়। ইহাতে যদি কৃতঘ্নতা দোষ জন্মে, তাহা হইলে অবশ্য হরকুমারকে সে দোষে দোষী করিতে পারা যায় না।

দুই পক্ষের কথা শ্রবণানন্তর সত্যব্রত ধীরভাবে কহিল—আশ্রয়হীনকে সে যখন আশ্রয় দিয়াছে, তখন সে কিছুতেই তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিতে পারে না। সে কথার উত্তরে অহিশেখর অনেক যুক্তিতর্ক করিল, মধুসূদন এবং তাহার পুত্র বিশ্বনাথ, অহিশেখরের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্যব্রতকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিল। কিন্তু সত্যব্রত সে সকল তর্কযুক্তি ভয়-প্রদর্শন গ্রাহ্য-মাত্রও করিল না। তখন তাহাদের মধ্যে ভীষণ শত্রুতার সৃষ্টি হইল। সত্যব্রত হরকুমারকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—"আপনি নির্ভয়ে এ স্থানে অবস্থান করুন। আপনাকে রক্ষার জন্য আমার ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিল।"

বিবাদটা ক্রমে খুবই পাকিয়া উঠিল। মারপিট্, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতি করিতে মধুসূদন ও অহিশেখর কোনও ত্রুটী রাখিল না। মধুসূদনের পাপিষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ সে বিষয়ে তাহার পিতা ও পিতৃবন্ধুকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহাতেও সত্যব্রতকে আঁটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। ধর্ম্মবল সত্যব্রতকে রাজদ্বারে ও অন্যান্য সঙ্কটে রক্ষা করিতে লাগিল।

যখন সকল অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন বিশ্বনাথ সঙ্কল্প করিল, সে তাহাকে হত্যা করিবে। এই বিশ্বনাথ সত্যব্রতের নিকটে নানা বিষয়ে উপকৃত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ একবার ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া অর্থাভাবে এক বিষম বিপদে পড়িয়া যায়। সত্যব্রতের নিকটে সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহা বিবৃত করিলে সত্যব্রত সেই দণ্ডে তাহার প্রতীকারে যত্নবান্ হইয়াছিল। সে সময়ে সত্যব্রতের হাতে কপর্দ্দক মাত্রও ছিল না। পত্নীর স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে সত্যব্রত সে যাত্রা বিশ্বনাথকে সেই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করে। বিশ্বনাথ এখন সে কথা চেষ্টা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার পর রোগে, শোকে, অন্নকষ্টে, রাজদ্বারে, শ্মশানে সত্যব্রত যে বিশ্বনাথের এবং বিশ্বনাথের আত্মীয়বর্গের কি প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অবতারণা করিতে হয়। সেই বিশ্বনাথের সঙ্কল্প, সে সত্যব্রতকে হত্যা করিবে! আর তাহার নরাধম পিতাও সে প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। লোভের, পাপের, কালের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য !

সে প্রস্তাবের সমর্থন করিল না কেবল অহিশেখর। হত্যা-কাণ্ডের প্রস্তাব শুনিয়া সে কল্পনায় কারাগৃহ, ফাঁসিকাষ্ঠ

প্রভৃতির চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। অহিশেখর, মধুসূদন ও বিশ্বনাথকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া কহিল—"ও সকল খুন জখমে আর কাজ নাই। কি জানি, কিসে কি হ'য়ে যায়।"

অহিশেখরের কথা মধুসূদন ও বিশ্বনাথ অমান্য করিতে সাহস করিল না। তাহাতেই তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইত্যবসরে মনোরমার লিখিত রমেন্দ্র-কিশোরের পত্রদ্বয় যথাস্থানে নিরাপদে পোঁছিল। তাহাতে একটা নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইল। মধুসূদন ও অহিশেখর প্রভৃতি ভাবিতে লাগিল—সত্যব্রতের ইহা একটা নূতন চাল। আর সত্যব্রত প্রভৃতি ভাবিল—ইহা হয়ত বিশ্বনাথের একটা নূতন নষ্টামী—নূতন বিপদ ঘটাইবার সূচনা।

রমেন্দ্রের পত্রে কাহারও নাম সাক্ষরিত ছিল না। সে পত্রে লিপি কুশলতারও বিশেষ অভাব ছিল। তাহাতে সকলেই মনে করিল যে, এ পত্রখানার কিছুই মূল্য নাই। ডাকঘরের "ছাপও" অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং পত্রখানা যে কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহা দুই পক্ষই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না।

সে যাহা হউক সে ব্যাপার লইয়া দুই পক্ষেই তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল, পত্রপ্রাপ্তির পরে দুই পক্ষই আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুই পক্ষেই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইল। একপক্ষ ভাবিল—বুঝি সর্ব্বনাশ উপস্থিত; অপর পক্ষ ভাবিল—ইহা বুঝি আশার ক্ষীণালোক!

বিংশ পরিচ্ছেদ

রজনী চন্দ্রমাশালিনী। তবে দুই একখানা কৃষ্ণ ও পিঙ্গল-বর্ণের মেঘ মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য চন্দ্রদেবকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। তাহাতে জ্যোৎস্নাধারা কলঙ্কিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সে কলঙ্কে শোভার ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং তাহা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুনীল মহান্ আকাশমণ্ডলে ক্ষপাকর তখন রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, নক্ষত্ররাজি তখন নিষ্প্রভ। সেই বিরাট জ্যোৎস্না-রাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করিতেছে মাত্র কয়েক খণ্ড শিশু মেঘ। কিন্তু বিপ্লববাদিগণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। বায়ুস্রোতে তাহারা যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা আর নির্ণয় করিতে পারা গেল না। দুর্ব্বল জলদদল অচিরে বায়ুমণ্ডলে মিশাইয়া গেল, মেঘনির্ম্মুক্ত কুমুদ-বান্ধব কৌমুদী ছটায় আবার দিগদিগন্ত সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিল। তখন মনে হইতে লাগিল, যামিনীতে বুঝি রবির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রদীপ্ত রজনীর শোভা তখন নবকিরণো-দ্ভাসিত, গীতিমুখরিত প্রভাতালোককেও পরাজয় করিয়াছে।

সেই জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করিয়া ফুল, পাতা, তরু, লতা, প্রান্তর প্রভৃতি কি যেন একটা নূতন রূপ, অভিনব উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে তাল তমালতল, কুঞ্জ কুটীর ও অরণ্যানী

সে আলোকে তেমন আলোকিত হয় নাই। কিন্তু আলো ও ছায়ার সংমিশ্রনে তাহা অলৌকিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া বুঝি অভাবুককেও ভাবুক হইতে হয়, আর ভাবুককে ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়।

সেই রজতশুভ্র রজনীতে জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া একটী যুবক ও একটী যৌবনোন্মুখী বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল। যুবক মুক্ত প্রান্তরের দূর্ব্বাদল শয্যায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় চন্দ্রিকাসুধা পান করিতেছে—তাহার দৃষ্টি জ্যোৎস্নাপুলকিত আকাশের দিকে; আর বালিকার দৃষ্টি কৌমুদী বিধৌত ভূমিতলে। তবে পরস্পরের লুব্ধনেত্র যে পরস্পরের রূপমাধুরী সুযোগ ও অবসর মত চুরী করিয়া দেখিয়া লইতেছিল না, এমন কথা বলিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

যুবক কহিল—"ওটা তোমার মিষ্টালাপ মাত্র। আমার জ্ঞান ও বিবেচনা মতে বল্‌তে পারি যে, তুমি আমার রোগশয্যাপার্শ্বে না থাক্‌লে এ যাত্রা আমার আর রক্ষা পেতে হ'ত না।"

লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাবনতা বালিকা ধীরে ধীরে কহিল—"জলে যখন ভেসে গিছলাম, তখন আপনি আমায় রক্ষা না কর্‌লে কেমন ক'রে আপনার সেবা ক'র্‌তে পার্‌তাম্?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবক বলিল—"সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা বিপদভঞ্জন মধুসূদন।"

সে কথার উত্তরে বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, যুবক তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া কহিল—"যথার্থ বলেছ, তোমায় বাঁচাতে না পারলে বুঝি আমার বাঁচাও আর হ'ত না। আর্ত্তের উদ্ধারে আমার দেহে মত্তহস্তীর বল এসেছিল—তাই কূল পেয়েছি। নতুবা কি হ'ত কে জানে!"

এই কথা বলিয়া যুবক আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে নিশ্বাসের স্রোতে পূর্ব্বস্মৃতির তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। যুবকের তরঙ্গায়িত হৃদয় শান্ত করিবার উদ্দেশে বালিকা কহিল—"ও সকল কথায় আর কাজ নাই। চলুন্, আপনি গৃহে চলুন।"

গৃহে যাইবার অনুরোধ শুনিয়া যুবক ক্ষিপ্ত গতিতে উঠিয়া বসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠির উত্তর এসেছে কি?"

"কই না।"

"তবে বাটীর কথা ব'লছ?"

"কই না!"

"এই মাত্র যে বল্‌লে?"

"আমি কুটীরে যা'বার কথা বলেছি—অন্য কথা বলি নাই ত!" সম্মুখস্থ কুটীরের দিকে চাহিয়া যুবক কহিল—"ঐ কুটীর, ঐ কুটীর—আমাদের আশ্রয়স্থল—ঐ কুটীর! ঐ কুটীরে আমি রোগশয্যায় শয়িত ছিলাম, আর সেই রোগশয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হ'য়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলে একা তুমি! ইচ্ছা

হয়, আবার রোগশয্যায় শয়িত হই—আবার তুমি আমার সেবা কর—ও রোগশয্যা আমার পক্ষে বড় মধুর,—ও রোগশয্যা আমার পক্ষে স্বর্গবাস। অপ্রতিভ হইয়া বালিকা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। সেই সময়ে বনান্তরালে সঙ্গীতরব উঠিল। সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া, যুবক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গায় ?"

"সেই সন্ন্যাসীর শিষ্য। আমার কাছে এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি খান, কি করেন, কেমন থাকেন—সকল কথা জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু সহস্র অনুরোধেও আপনার কাছে আসেন না, আস্‌তে চান্ না।"

"কেন ?"

"তা' ত জানি না। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তিনি হাসেন মাত্র।"

"সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হ'লে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব—এর কারণ জান্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। সন্ন্যাসী আমাদের আশ্রয়দাতা, জীবন রক্ষাকর্ত্তা, তাঁর শিষ্যের দর্শনলাভে আমি বঞ্চিত হব কেন ?"

সঙ্গীতের সুর তখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞাত গায়ক তখন গাহিতেছে—

"মধুর যামিনী মধুর চাঁদিনী
মাধুরী ধরে না আর;

হেন কালে মরি কই সে বাঁশরী
কোথা দেখা পাব তা'র ?
সে যে ভালবাসে, থাকি তা'র আশে
সে যে গো আমার সব ;
সে বিনা আমার কেহ নাহি আর
সে বিনা আমি গো শব।
আমার সে জন কোথায় এখন
লুকা'য়ে বসিয়া আছে ;
দিবারাতি ঘুরি তা'রি আশে ফিরি
সেও ফিরে মোর পাছে।
শুনি সবে কয় সে গো সর্ব্বময়
তুলনা নাহিক তা'র ;
পাইয়াছি কূল, এ কেমন ভুল
তবু ধাই পাছে তা'র।"

সঙ্গীত থামিল—কিন্তু মূর্চ্ছনা ও গমকের ঝঙ্কার তখনও ব্যোমস্তরে ঝঙ্কৃত হইতেছে, ঝিল্লীরবে মুখরিত দিঙ্মণ্ডলে সুরের ঝঙ্কার অনুভূতির স্রোতে মধুময় হইল। কিন্তু সে সঙ্গীতমাধুরী যুবক শ্রোতার আদৌ ভাল লাগিল না। বেদনাসঙ্কুচিত হইয়া—আপন মনে সে ভাবিতে লাগিল—এ গানের যে রচয়িতা সেই কি গায়ক! গীত শুনিয়া মনে হইতেছে, কেহ কাহাকেও ভালবাসে। সে ভালবাসা বড় গভীর, বড় জ্বালাপ্রদ, বড়

রহস্যময়। কিন্তু সে ভালবাসায় পরস্পরের সুখ আছে, শান্তি আছে—তবে সে সুখ, সে শান্তি ইহলোকের নহে।

যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল—এ প্রেমোন্মত্ত গায়ক কি তবে তাহারই ভালবাসার সামগ্রীকে ভাল বাসিতে চাহে—ভালবাসে ?

সে প্রশ্নের উত্তর সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল। সে ভাবিল—ভালবাসাই সম্ভব। গায়ক নিশ্চয়ই যুবকের ভালবাসার পাত্রীকে ভালবাসে। নতুবা সময়ে অসময়ে সে আসিয়া বালিকার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করে কেন ?

যুবকের ভালবাসার সামগ্রীকে অপরে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে কল্পনা করিয়া, যুবক বিশেষ দ্বেষপরায়ণ হইল। কিন্তু সে আবার ভাবিল, কিন্তু "বালিকা কি গায়ককে ভালবাসে ?" এ প্রশ্ন তাহার মনে উদিত হইতেই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাঠকগণের বোধ হয় বুঝিতে আর বাকী নাই যে, যুবক —রমেন্দ্রকিশোর ; আর বালিকা—মনোরমা। রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে তখন কি এক নূতন চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছে। রমেন্দ্রকিশোর তখন স্থির জানিয়াছে—মনোরমাই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব, মনোরমা ভিন্ন তাহার জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই রমেন্দ্রকিশোরই একদিন বিবাহের নাম শুনিলে

আতঙ্কিত হইত, ঘটক দেখিলে তাহাকে তাড়া করিত, আর এই রমেন্দ্রই তাহার পিসীমাতা শিবসুন্দরীর অনুরোধ উপরোধেও বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাতেই শিব সুন্দরীর বর্দ্ধমানে আগমন আর সেইখানেই মৃত্যু! সেই রমেন্দ্র এখন মনোরমার চিন্তায় আত্মহারা। কালের মহিমায় এমনই হয়!

সে যাহা হউক, বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলে—রমেন্দ্রকিশোর সিদ্ধান্ত করিল, মনোরমা গায়ককে আদৌ ভালবাসে না, ভাল বাসিতে পারে না। সে সিদ্ধান্তের ফলে—সে কতকটা শান্ত হইল এবং কুটীরে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। তখন কিশোরীদাস আলোকআঁধারবেষ্টিত তালকুঞ্জে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া রসরঙ্গে গাহিতেছে—

"রাধে গো একবার থালি চাও।
(আমার) প্রাণের কথা, হৃদয় ব্যথা
বল্‌তে মোরে দাও।
রূপে তুমি গরবিণী
মনে করেছ ও মানিনী,
(আমি) এখন দাঁড়াই কোথায়,
ব'লে আমায় দাও।
(তোমার) মানের দায়ে প্রাণ যে গো যায়
এখন আশ্বাসে বাঁচাও।"

কুটীরপথে আসিতে আসিতে মনোরমা ও রমেন্দ্রকিশোর সে গান শুনিল। সে গান শুনিয়া ও গায়কের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু মনোরমা তখন বিশেষ গম্ভীর। তাহার এ গাম্ভীর্য্যের একটু কারণ ছিল। দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি অন্ধকারের একটা আশ্রয়ে কিশোরীদাসের পার্শ্বে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল।

রমেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাজী, ওরা কা'রা?" কিশোরী-দাস বলিল—"ওরা—নবাগত; অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছে।"

রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। তাহারা চলিয়া গেল। কিশোরীদাস তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আগন্তুকদ্বয়ের সহিত কি একটা গভীর পরামর্শ করিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রিতে রমেন্দ্রকিশোর নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিল না—কাজে কাজেই মনোরমারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল। রমেন্দ্রকিশোর নিদ্রা না যাইলে মনোরমা নিদ্রা যায় কেমন করিয়া? রমেন্দ্র এখন তাহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে।

রমেন্দ্র ভাবিতেছিল—মনোরমা পত্র লিখিল, সে স্বয়ং পত্র লিখিল, তথাপি বাটী হইতে কিংবা সত্যব্রতের নিকট হইতে পত্রের কোনও উত্তর আসিল না কেন? পত্রের উত্তর ত দূরের কথা—পত্র পাইয়া সত্যব্রতের নিজের আসা উচিত ছিল। অথবা কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া তাহাদের সংবাদ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা হইল না কেন? মনে মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিতেছিল, তাহার কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া রমেন্দ্রকিশোর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল, সত্যব্রতও বুঝি ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। সে কথা মনে হইতেই সে শিহরিয়া উঠিল—তাহার অভিমানানল শীতল হইল।

কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের নিজবাটীর সংবাদ কি? সেখানেও কি দুর্ব্বিপাক! রমেন্দ্রকিশোর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু

সে চেষ্টার ফল হইল বিপরীত। দুশ্চিন্তামুক্ত হইবার জন্য সে যত অধিক চেষ্টা করিতে লাগিল, দুশ্চিন্তাভার তাহাকে ততোধিক বিব্রত করিয়া তুলিল।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে —ঘুমায় নাই কেবল ঘুম যাহাদের ভাগ্যে নাই।

বিনিদ্র রমেন্দ্রকিশোর তথাপি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভিন্নাসনে উপবিষ্টা মনোরমা তখন অত্যন্ত নিদ্রা-কাতরা; তথাপি রমেন্দ্রকিশোরকে ব্যজন করিতে তাহার বিরক্তি বা অবসাদ নাই।

রমেন্দ্রকিশোর সস্নেহে মনোরমাকে কহিল—"যাও, শোওগে —না হ'লে অসুখ ক'র্‌বে।"

মৃদু হাসিয়া মনোরমা বলিল—"আমার ঘুম পায় নাই।"

নিদ্রা সম্বন্ধে রমেন্দ্রকিশোর, মনোরমাকে আর কোনও অনুরোধ করিল না। উদাসীনভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া সে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল। ভক্তের আরাধনায় দেবী কথঞ্চিৎ তুষ্টা হইলেন। তাহার ফলে ভক্ত একটু তন্দ্রাতুর হইল মাত্র। কিন্তু সুনিদ্রা তাহার আদৌ হইল না। সন্ন্যাসীর শিষ্যের কথা তখন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে।

গৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল—উন্মুক্তই থাকে। কুটীরের "দাওয়ায়" কিশোরীদাস নিদ্রা যায়। সুতরাং দ্বার আর বন্ধ

করিতে হয় না। আর জীর্ণ ভগ্ন দ্বার বন্ধ করিবারও তেমন উপায় নাই।

সেই মুক্তদ্বারপথে চারি পাঁচজন বলিষ্ঠ লোক প্রবেশ করিয়া নিমেষের মধ্যে রমেন্দ্রকিশোরকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং সে যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, দস্যুগণ তাহারও ব্যবস্থা করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মনোরমা ভয়ে বিস্ময়ে প্রায় অচৈতন্যা হইয়া পড়িল। দস্যুগণের মধ্যে এক আধজন অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাদের "শীকার"—রমেন্দ্রকিশোর। "শীকার" হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তাহারা সে দিকে আর বড় মন দিতে পারে নাই।

নিমেষের মধ্যে "শীকার" স্কন্ধে বহন করিয়া শীকারিগণ অদৃশ্য হইল। তখনও মনোরমা অচৈতন্যা।

কিশোরীদাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মুখে চ'খে জলের ঝাপ্টা মারিয়া মনোরমার চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল। জ্ঞানলাভ করিয়াই সে উদাসীন দৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কিশোরী-দাসকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি কোথায়?"

কাহার কথা মনোরমা যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা বুঝিতে কিশোরীদাসের আর বিলম্ব হইল না। সে প্রশ্নের উত্তরে সে মনে মনে বলিল—"যমালয়ে।" তবে প্রকাশ্যে তাহা বলিতে তাহার সাহস হইল না।

মনোরমার প্রশ্নের উত্তরে কিশোরীদাস অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল—

"তোমার তানার কথা আর জিজ্ঞেস্ করোনি গো, জিজ্ঞেস্ করোনি। বেটা ডাকাত, বদমাস্। সে বেটা পাজি,—বেটা নচ্ছার, বেটা কা'র বাড়ীতে কি নচ্ছারপনা করেছ্যাল, তা তা এসে নচ্ছারটাকে পাকড় কোরে নিয়ে গ্যাল। এইবার নচ্ছার বেটা—বুঝ্লে কিনা—এইবার নচ্ছার বেটা ফাঁসির রসিতে ঝুল্‌তে থাক্‌বে। আরে ছ্যা, আরে ছ্যা ছ্যা; আরে নচ্ছার বেটার নচ্ছারির কথা জান্‌তে কি! এই যত গোল বাঁধালে সন্ন্যাসী ঠাকুর। ভষ্যি হ'বার ভয়ে তানার কথা শুন্‌তে হ'ল। শেষে এই বিপত্তি।

কিশোরীদাস যে এতগুলা কথা একটানে বলিয়া গেল, মনোরমার কর্ণে তাহার একটী শব্দও প্রবেশ করিল না। ভয়বিহ্বল চিত্তে সে কেবল ভাবিতেছিল, কাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং তাঁহার অবস্থাই বা এখন কিরূপ? মনোরমার চিন্তা কেবল তাহার প্রাণদাতা জীবনসর্ব্বস্ব রমেন্দ্র-কিশোরকে লইয়া। কিশোরীদাসের তর্ক যুক্তি কিছুতেই মনোরমার একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে পারে নাই। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীদাস রূপবতী কিশোরীর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। রূপ-তৃষা বৈষ্ণবকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। রূপোন্মাদ কিশোরীদাস উন্মত্তভাবে রূপবতী মনোরমার সন্নিকটস্থ হইয়া

ব্যাকুলভাবে কহিল—সে গ্যাছে, যা'ক্, আমি ত রইছি সুন্দরী। ভিক্ষা করি আনি তোমার খাওয়ান্ পরান করব। তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি খাও দাও, বগল বাজাও। দয়া ক'রে আমি তোমায় আমার চরণে স্থান দেব।

কিশোরীদাসের ধৃষ্টতা দেখিয়া মনোরমা প্রকৃতিস্থ হইল। আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইল। তাহার ভ্রূকুটী দেখিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি একটু ভয় পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে সে ভগ্নোৎসাহ হইল না। কিশোরীদাস ভাবিল, প্রথম প্রথম সকলেই অমন চক্ষু রক্তবর্ণ করে।

অশ্রুজলে মনোরমার বক্ষঃস্থল তখন ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবের দয়া বা সহানুভূতির উদ্রেক হইল না। মনোরমাকে সেবাদাসী হইবার জন্য সে সবিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—এবং সে যে একজন বিশেষ ভদ্রলোক তাহার প্রতি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে বিশেষ প্রয়াস পাইল। এমন কথাও কিশোরীদাস প্রকাশ করিল যে তাহাকে ভজনা করিলেই মনোরমার ভাগ্যে কৃষ্ণভজনার ফল ফলিবে। কিন্তু গর্ব্বিতা মনোরমা সে সকল উপদেশবাণীতে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিল এবং এমনভাব প্রকাশ করিল যে, তাহাতে অনুমান করা যায়, কৃষ্ণানুরাগের সঞ্চার তাহার মনে আদৌ হয় নাই। সে রমেন্দ্রকিশোরের নিকট যাইতে চাহিল এবং বৈষ্ণবচূড়ামণিকে

সংযতভাবে কথা কহিতে বলিল। তখন বৈষ্ণবের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। দুই তিন ঘণ্টাকাল তর্কবিতর্ক, অনুনয়-অনুরোধ করিয়াও যখন কিশোরীদাস সিদ্ধকাম হইবার উপায় দেখিতে পাইল না, তখন ক্রোধপরায়ণ না হইয়া সে আর করে কি? আপান ধর্ম্মে বৈষ্ণবের যে বিশেষ আস্থা ছিল, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহা মনে করিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পরের ধর্ম্মরক্ষায় কেন সে যত্নবান্ হইবে?

এইবার মনোরমা সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিশোরীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাপুরুষ কিশোরীদাস আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তবে আশাও সে ছাড়িতে পারিল না। তখন বৈষ্ণবকুলগ্লানি রূপতৃষ্ণায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, আর সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য মনোরমা উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃশ্য কি বীভৎস এবং কি মধুর!

রাত্রি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম ঊষার প্রথম বাতাস তখন ধীরে ধীরে বহিবার লক্ষণমাত্র প্রকাশ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোক তখন শূন্যে শূন্যে মিশাইয়া যাইবার পথানুসন্ধান করিতেছে, আর সেই সঙ্গে দুই চারিটা রসিক নির্ভীক বিহগ কল-কাকলীতে শূন্য মহাশূন্য গীতিময় করিয়া তুলিতেছে। পক্ষীর এ রহস্যালাপ, চন্দ্রালোকের প্রতি এ বিদ্রূপ দিবাকরের আগমন সংবাদে। নিশাসমাগমে দ্বিজকুল দৃষ্টি হারাইয়াছিল, দিননাথের উদয়ে তাহারা চক্ষুষ্মান্ হইয়াছে। এই কারণেই তাহাদের

সাহস বাড়িয়াছে, জ্যোৎস্নালোককে বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সুদিন পাইলে জীবমাত্রেরই এইরূপ হয়। দোষ দিব কাহার ?

ঊষার বাতাস ও পক্ষিকুলের ঝঙ্কারে পাপী বুঝিল তাহার পাপাচরণের সময় উত্তীর্ণপ্রায়। অতএব সে অধিকতর উন্মত্ত হইয়া মনোরমাকে অধিকতর বিব্রতা করিয়া তুলিল। অসহায়া মনোরমা বিপদ্‌বারণের নাম স্মরণ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাতরা কিশোরীর কাতর নিবেদন বুঝি করুণাময় শুনিলেন। বিমলানন্দের শিষ্য নবীনানন্দ কুটীরদ্বারে আসিয়া ডাকিল—"বাবাজী।" কৃষ্ণপ্রেমিক "বাবাজী" যখন দেখিল সে স্থানে বলরামের উদয় হইয়াছে, তখন সে বুঝিল, সে স্থান আর নিরাপদ নহে। রণে ভঙ্গ দিয়া সে পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু বলরামের শালপ্রাংশু মহাভুজ প্রেমিক সেনানীকে ধরিয়া ফেলিল। তখন বৈষ্ণবরাজ কম্পিত কলেবর এবং ঘর্ম্মাক্ত দেহ। ঘর্ম্মাক্ত হইলে লোকের জ্বর ছাড়িয়া যায় শুনা গিয়াছে ; কিন্তু কিশোরীদাসের দুর্ভাগ্য-ক্রমে ঘামিয়াই তাহার জ্বর আসিল। নবীনানন্দের মুষ্টি তখন দৃঢ়, চক্ষু তখন রক্তবর্ণ, মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত ও মধুস্থদন উভয়েই মনোরমার পত্র পাইয়াছিল; কিন্তু লেখার দোষে পত্রের সম্যক্ সমাচার কেহই বিশেষরূপ অবগত হইতে পারে নাই। তবে সে পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই যে একটা "সাড়া" পড়িয়াগিয়াছিল তাহার আভাষ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে পত্রে নাম ধাম কিছুই ছিল না বলিয়া সত্যব্রত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেমন একটা "খট্‌কা" লাগিয়া গেল।

মধুস্থদনের মনের ভাব তখন কিরূপ এবং সত্যব্রত কিরূপ মনোকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অসুস্থতা হেতু রমোন্দ্রকিশোর স্বয়ং কোনও পত্রাদিই পূর্ব্বে লিখিতে পারে নাই। সেই সুযোগে মধুস্থদনের দিন একপ্রকার বেশ সুখে কাটিয়া গেল। তবে সে একবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই।

ভগবৎকৃপায় ও বিমলানন্দ ভারতী প্রভৃতির যত্নে তৎপরে রমেন্দ্রকিশোর সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়াই সে স্বয়ং পত্র লিখিতে বসিল। একখানা পত্র লেখা হইল, তাহার নিজ বাটীতে আর একখানা পত্র গেল সত্যব্রতের নিকটে। পত্র দুইখানি যথাস্থানে পৌঁছাইতে কিছু বিলম্বও ঘটিয়াছিল। জলপ্লাবন হেতু গ্রাম্য

ডাকবিভাগের তখনও বেশ বন্দোবস্ত হয় নাই। এই কারণেই পত্র পৌঁছাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

পত্র যখন যথাস্থানে পৌঁছিল, তখন মধুসূদন ও অহিশেখর উভয়েরই মস্তক ঘুরিয়া গেল। সত্যব্রত সেদিন স্থানান্তরে গিয়াছিল। তাহার পত্র পড়িয়া রহিল।

ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মধুসূদন ও অহিশেখর বিশুষ্কমুখে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কোনও কথাই নির্গত হইল না। উত্তেজনার প্রথম বেগটা কথঞ্চিৎ সাম্‌লাইয়া রমেন্দ্রকিশোরের পত্রখানা তাহারা পুনরায় পড়িতে লাগিল।

পত্র আসিয়াছিল অবশ্য মনোহর দাসের নামে। মনোহর দাস, রমেন্দ্রকিশোরের পিতার আমলের লোক। রমেন্দ্র তাহাকে খাতাঞ্জি দাদা বলিত। সে খাতাঞ্জি দাদাকে লিখিয়াছে,—দৈবানুগ্রহে সে রক্ষা পাইয়াছে। আরও অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় কথা লেখা ছিল। পত্রের ঠিকানা প্রভৃতি দেখিয়া মধুসূদন একবার ভ্রূকুটি করিল, তৎপরে অহিশেখরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। সেই সময়ে মধুসূদনের পাপিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ পরামর্শ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর পরামর্শের পর স্থির হইল, বিশ্বনাথ লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই দিবসই অপরাহ্ণে রমেন্দ্রকিশোরের সন্ধানে যাত্রা করিবে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার জ্ঞান বুদ্ধি মত ব্যবস্থা করিবে।

পাষণ্ডের বুদ্ধিমত পাষণ্ড-ব্যবস্থা করিল। সে ব্যবস্থায় রমেন্দ্রকিশোর দস্যুহস্তে বন্দী হইল এবং তাহাতে যে তাহার প্রাণের আশঙ্কাও ছিল না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

বৈষ্ণব বাবাজীরও এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, মনোরমার লোভে এবং যৎকিঞ্চিৎ রজতখণ্ডের মহিমায় কিশোরী দাস দস্যুগণের সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। দস্যুসর্দ্দার বিশ্বনাথ মনোরমা লাভে একটু যে যত্নবান না হইয়াছিল, এমন্ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে তাহা করিলে কিশোরী-দাসের সাহায্য পাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িত। সুতরাং সে যাত্রা তাহাকে সে লোভ সংবরণ করিতে হইল।

মনোহরদাস এখন সত্যব্রতের বাটীতে। রমেন্দ্রকিশোরর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া মধুসূদন সে বাটীতে প্রবেশ করিতেই মনোহর দাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অথবা এমন বলিলেও বলা যাইতে পারে, মধুসূদন তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি তাহার আশ্রয়স্থল লত্যব্রতের বাটী। সুতরাং তাহার পত্র তাহার হস্তগত হয় নাই।

রমেন্দ্রকিশোর-লিখিত সত্যব্রতের পত্রের "শিরোনামা" দেখিয়া মনোহর দাস চমকিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল— "এ হস্তাক্ষর কাহার! দুর্ব্বলতা হেতু রমেন্দ্রকিশোরের লেখাটা ঠিক মত হয় নাই। সেই জন্যই মনোহর দাস একটু গোলে পড়িয়া গেল। ভরসা করিয়া সে পত্র সে উন্মোচন করিতে

পারিল না। প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী নিরুদ্দিষ্ট প্রভুর হস্তাক্ষরের সেই সাদৃশ্য দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে আঁখিবারি ফেলিতে লাগিল এবং সত্যব্রতের প্রতীক্ষায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। মনোরমার পিতা হরকুমারও সে ব্যাকুলতা ও সে অশ্রুধারার অংশ গ্রহণ করিল। রমেন্দ্রকিশোর যে তাঁহার ভাবী জামাতা!

তৎপরদিবস সত্যব্রত কার্য্যস্থান হইতে প্রত্যাগত হইল। পত্রখানি তাহার হস্তগত হইতেই তাহার হস্ত কাঁপিয়া উঠিল। পত্র হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মনোহর দাস তাড়াতাড়ি পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া অধীরতার সহিত পাঠ করিতে লাগিল

"অভিন্নহৃদয় ভাই সতু, কল্যাণপুর।

জানিনা এখন তুমি কোথায় এবং কি অবস্থায় আছ। তবে আশা করি, মঙ্গলময় তোমায় এবং তোমার আত্মীয়স্বজনকে মঙ্গলে রাখিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় আমি এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়াছি। সে বাঁচার বৃত্তান্ত অনেক। সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা মনে করিয়া বলিব।

ইতি পূর্ব্বে আমি তোমাকে এবং খাতাঞ্জিদাদাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। লেখাটা অবশ্য আমার নহে। যাহাকে বাঁচাইতে গিয়া জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলাম, লেখাটা তাহারই। সেও দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া গিয়াছে। জানিনা, তাহার পত্র তোমরা পাইয়াছ কি না। জানিনা বলিলাম, এইজন্য—এ পর্য্যন্ত সে পত্রের উত্তর পাই নাই।

যাহা হউক, পত্রপাঠ তোমরা সকলে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবে। আমি যদিও সুস্থ হইয়াছি, তথাপি অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহা ভিন্ন অর্থাদিও আমার নিকটে নাই! খাতাঞ্জি-দাদাকে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিবে। এখানে আমার কিছু অর্থের আবশ্যকও আছে। খাতাঞ্জিদাদার পত্রে সকল কথা লিখিয়া দিয়াছি। তুমি সে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিও।

আমি এখানে এক দরিদ্র বৈষ্ণবের গৃহে আছি। প্রাণ পাইয়াছি এক মহাপুরুষের কৃপায়। সুস্থ হওয়া অবধি তাঁহার, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্যের আর বড় দর্শন পাই না। আর্ত্তের উদ্ধারে তাঁহারা সততই ব্যস্ত। তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ বিলক্ষণ। তাঁহাদেরই কৃপায় আমরা কুশলে আছি! বৈষ্ণব বাবাজী আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে এবং অবসর মত খঞ্জনী বাজায় এবং বেতালা গান করে। তাহাতে আমাদের বেশ আনন্দ হয়।

ভাই আর একটু গোপনীয় কথা অছে। সে কথা তোমাকে না বলিলে আর কাহাকে বলিব। যাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমি অকূল পাথারে পড়িয়াছি, তাহার নাম মনোরমা। স্বর্গগতা পিসীমাতা তাঁহারই সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন—সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। পিসীমাতার অভিশাপ এতদিনে আমার ভাগ্যে ফলিয়াছে। আমি তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং

তাহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতেও যে স্পৃহা ও ঔৎসুক্য নাই, এমন কথাও এখন আর আমি বলিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, বোধ হয় তাহার সেবা, যত্ন; আর—আর বুঝি তাহার সুন্দর মুখ-শ্রী, সুন্দর চাহনি আর অতি সুন্দর অতি মিষ্ট সম্ভাষণ। তাহার কথা এত করিয়া বলিতেছি বলিয়া হয়তো তুমি হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ। কি করিব ভাই. মানুষ ঘটনাচক্রের অধীন। সে কথা যাউক। তোমরা আসিবে তারকেশ্বরের পথে। কল্যাণপুর তারকেশ্বরের অতি সন্নিকটেই। বর্দ্ধমান হইতে ভাসিয়া আসিয়া কল্যাণপুরে আশ্রয় পাইয়াছি। ইহা বুঝি আমাদেরই কল্যাণের জন্য। তারকনাথ আমাদের দয়া করিয়াছেন। তারকেশ্বরে আসিয়া কল্যাণপুরের সন্ধান করিও—সন্ধান মিলিবে।

মিত্রমহাশয় ও মনোরমার পিতাকে আমাদের সংবাদ জানাইও—তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি তোমরা মঙ্গলে থাক। তুমিই আমার জীবন মরুভূমে একমাত্র তরুচ্ছায়া। এ কথায় মেজ-বৌ তোমার সোহাগের অর্দ্ধাঙ্গিনীর ক্রোধের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহাকে বলিও শীঘ্রই তাঁহার সহচরী মিলিবে। কথাটা শুনিয়া তাঁহার অধর কোণেও হয়ত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার বলি, কি করিব; আমি নাচার। মানুষ গড়ে—ভগবান্ ভাঙ্গেন।

তোমার সন্তানসন্ততিগণকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ দিও। আর যদি পার, তাহা হইলে দয়া করিয়া মেজ-বৌএর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া আমায় ভুলিয়া বসিয়া থাকিও। আমি এখন মরিয়া ভূত হইয়াছি কি না?

তোমার চির সুহৃদ্‌ রমি।"

পুঃ—আসিবার সময় তারকেশ্বর হইতে পাল্কী ব্যবস্থা করিয়া আনিও। মেজ-বৌএর ভাবী সহচরী হাঁটিতে পারে না। আর হাঁটিতে তাহাকে দিবেই বা কে? আমিও দুর্ব্বল। আমারও একখানা পাল্কী চাই। ফিরিবার সময় তোমাদেরও পাল্কীর দরকার। সে সকল ব্যবস্থা তোমাদের, তোমরা করিও। জলে ভাসিয়া আমি এখন স্বার্থ চিনিয়াছি। কথাগুলা শুনিয়া মেজ-বৌ মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতেছে কি? না হাসিলে বলিব—বহুৎ আচ্ছা। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে সত্যব্রত প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে পুলকিত হইল। মনোরমার মাতাকেও সে সকল কথা শুনান হইল। পাগলিনী সে সকল কথার কিছুই বুঝিল না। তাহার অট্টহাস্যে হরকুমার সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। আহা! রমণী শোকে উন্মাদিনী; আনন্দসংবাদেও তাহার আনন্দানুভূতি হইল না।

কল্যাণপুর যাত্রার তখনই ব্যবস্থা হইল। একদিন বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া সত্যব্রতের দুঃখের আর সীমা রহিল না। সে

মনোহর দাসকে কহিল—"চিঠিখানা তখনই খুলিয়া তখনই ইহার একটা ব্যবস্থা করিলে না কেন দাদা। শুভকার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে কার্য্যহানি হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী রমেন্দ্রকিশোরকে স্কন্ধে বহন করিয়া দস্যুগণ নিঃশব্দে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। যদিও গ্রামগুলি জলপ্লাবনের ভীষণতায় তখন প্রায় জনমানবশূন্য, তথাপি দস্যুদল গ্রামের পথে চলিতে সাহস করিল না। বিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া তাহারা নীরবে নিঃশব্দে পথাতিক্রম করিতে লাগিল। ভবিষ্যৎ চিন্তায় ও সুদৃঢ় বন্ধন-জনিত যন্ত্রণায় রমেন্দ্রকিশোর তখন অচৈতন্য প্রায়। বিশেষ, তখনও তাহার শরীর দুর্ব্বল।

সে রাত্রে চন্দ্রদেবের কিছু শোভাধিক্য ছিল। রোহিণী-পতি, প্রিয়তমার প্রিয় সম্ভাষণে বুঝি গলিয়া গিয়াছিল। সুনীল আকাশতলে শশধর-শোভা তখন অপরূপ। প্রেমালাপে মত্ত নিশাকরের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ধরণী তখন সূর্য্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ধকার তখন বুঝি বনান্তরালেও স্থান পাইতেছিল না। চন্দ্রদেবের সে দীপ্তি ও সে হাসি দেখিয়া দস্যুগণ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল এবং ধরা পড়িবে বলিয়া প্রতিপদে আশঙ্কা করিতেছিল।

প্রান্তরমধ্যে তাহারা যে পথ ধরিয়াছিল, সে পথ পশ্চিম মুখে দামোদরের বাঁধের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সে পথের সন্নিকটে লোকজনের বাসও বড় একটা নাই এবং নিশাভাগে সে পথে

কেহ বড় একটা যাতায়াতও করে না। তবে দূরে দূরে গ্রাম আছে, দূরে দূরে বসতি আছে। সে সকল গ্রামের সন্নিকটে শ্মশানও দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুগণের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিল, বহুদূরে না যাইয়া নিকটস্থ কোন শ্মশানেই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সে প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল।

কিন্তু তাহাতে এক অন্তরায় ঘটিল। দূরস্থ একটা শ্মশানে তখন কোনও শবদেহের সংকার হইতেছে বলিয়া তাহাদের মনে হইল। চিতাধূমে আকাশ তখন পরিব্যাপ্ত। চিতালোকও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সুতরাং সে পথে যাইতে তাহাদের আর সাহসে কুলাইল না। তাহারা চাহে জীবন্ত মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে। সমাজশাসনের শক্তিতে লোকচক্ষুর গোচরে ত শ্মশানে জীবন্ত দগ্ধের রীতি নাই। অতএব তাহাদের উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। "জীবন্ত শবকে" বহন করিয়া তাহারা বাঁধের দিকে চলিল। বাঁধের নীচে দামোদরের গর্ভে এক মহাশ্মশান আছে। সে শ্মশানে রাত্রিকালে যাইতে কেহ বড় সাহস করে না। পাপিষ্ঠেরা পাপকার্য্য সাধনের জন্য মহাশ্মশানাভিমুখে উদ্দামভাবে ছুটিল।

দামোদরের বাঁধ একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। রাত্রিকালে সে বাঁধটা পাহাড়ের মতই দেখাইতেছিল। বাঁধের পার্শ্বে ও

উপরিভাগে যে সকল স্বচ্ছন্দজাত তরু গুল্মাদি জন্মাইয়াছিল, তাহাতে স্থানটার গাম্ভীর্য্য অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই বাঁধ পার হইয়া তবে শ্মশানে যাইতে হয়। বিপর্য্যয় ব্যাপার দেখিয়া পাপিষ্ঠগণের মধ্যে একজন সে স্থানে যাইতে একটু আপত্তি করিল। সেই পাপিষ্ঠের ইঙ্গিতে দস্যুগণ চালিত হইতেছিল। তাহারই নেতৃত্বে, ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় দস্যুগণের এই দস্যুতা। সেই পাপিষ্ঠ এইরূপ ভয় পাইয়াছে দেখিয়া অন্যান্য পাপিষ্ঠগণ সমধিক কৌতুকানুভব করিতে লাগিল এবং তাহাকে পাঁচকথা শুনাইয়া দিবারও লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু সে নরাধম সে দেশের লোক নহে, রাত্রি-কালে মহাশ্মশানে গমন করায় সে আদৌ অভ্যস্ত নহে। সুতরাং বাঁধ পার হইয়া সে কোন মতেই দামোদরগর্ভে প্রবেশ করিতে চাহিল না। ইতিমধ্যে একটী পেচক ভীষণ রব করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া গেল, দুই তিনটা ভীষণকায় কৃষ্ণবর্ণের কুক্কুর মনুষ্য সমাগম দেখিয়া তীরবেগে বনভাগে প্রবেশ করিল। দুর বনস্থলীতে তখন শিবারব উত্থিত হইয়াছে। গভীর রাত্রিতে এই সকল ব্যাপারের সমাবেশ দেখিয়া সাহসী নেতা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। বাঁধ তখন অনতি-দূরে। কল্পনাবশে সে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া দস্যুগণ বন্দীকে স্কন্ধদেশ হইতে নামাইয়া প্রান্তরস্থিত তৃণশয্যায় শয়ান করাইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—নেতাকে

তাহারা বালকভাবাপন্ন দেখিলে বাধ্য হইয়া তাহারা অবসর গ্রহণ করিবে। সর্ব্বনাশ!—সে ত্রিপান্তর মাঠে সেরূপ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া তাহারা স্থানত্যাগ করিলে কি আর রক্ষা আছে! কাজে কাজেই তাহাদের কথায় তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইল। তবে সে সকলের অগ্রে কিম্বা সকলের পশ্চাতে যাইতে চাহিল না। সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে গন্তব্য-স্থানে গমন করিতে লাগিল। সকলে যখন বাঁধের উপরে উঠিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল। দামোদর রজত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শান্তভাবে পড়িয়া আছে। জলকল্লোলের সঙ্গীতধ্বনি সেই স্থানটাকে তখন সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য তখন কে বুঝিবে?

অনতিবিলম্বে তাহারা মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। মহানীরবতার মধ্যস্থলে সেই মহাশ্মশান। ঝিল্লীরব ও মধ্যে মধ্যে হিংস্র সারমেয়কুলের বিকট চীৎকার সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র।

কৌমুদী শোভা সেই সময়ে কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। খণ্ড বিখণ্ড দুই একখানা মেঘ আকাশ পথে ভাসিয়া ভাসিয়া জ্যোৎস্নাধারা একটু মলিন করিয়া দিয়াছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশ যেরূপ মেঘমুক্ত ছিল, এখন আর সেরূপ নহে। প্রকৃতির এইরূপই প্রকৃতি, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

জ্যোৎস্নার মলিনতায় শ্মশানক্ষেত্র অধিকতর বিকট দেখাইতে

ছিল। শ্মশানভূমিস্থ পাদপশ্রেণীর তলদেশে কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর অন্ধকার জমাট হইয়া কি যেন একটা দুঃখের, শোকের ছায়া বিস্তার করিতেছিল। ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন কলসী, দগ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠভার—অঙ্গার, চিতাভস্ম, ছিন্নবস্ত্র, কঙ্কালাবশিষ্ট প্রভৃতি বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া পড়িয়া কি যেন একটা বেদনা মর্ম্মব্যথার প্রতিমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতেছিল, কি যেন কেমন অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল—আবার কখনও বা ভবিষ্যতের অন্ধকারে অথবা বিস্মৃতিসাগরে চিন্তা স্রোত মিশাইয়া দিতেছিল। সে দৃশ্যে অনেকেই বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—বিশেষ তাহাদের নেতা। কিন্তু কি করিবে—তাহারা একটা দুষ্কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে। সে কার্য্য তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তিবশে করিতেই হইবে। সুতরাং পরস্পরের উৎসাহে, পরস্পরের পরামর্শে সাহসে ভর করিয়া স্বকর্ম্মসাধনে তাহাদের প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাহা ভিন্ন তখন আর তাহাদের উপায় কি ?

দুর্ব্বৃত্তেরা অর্থলোভে কতক পরিমাণে ভয় ত্যাগ করিয়া বন্দীকে জীবন্তদাহ করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। শুষ্কপত্র বংশদণ্ড এবং অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা তাহারা এক চিতা সজ্জিত করিল এবং হস্ত-পদ বদ্ধ বন্দীকে সেই চিতার উপরে স্থাপিত করিল। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে নিরপরাধ বন্দী প্রাণের মমতায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া বদ্ধনাবস্থাতেও তাহার শরীর চালনা করিবার

চেষ্টা করিল। অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে চিতা হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডে সে পড়িয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া—চিতার উপর তুলিয়া দিবার আয়োজন করিতে লাগিল, ঠিক্ সেই সময়ে বনভাগ হইতে জলদ্‌গম্ভীর স্বরে কে ডাকিয়া বলিল—"তোমরা কা'রা ?"

অতর্কিত দস্যুগণ সেই মহাশ্মশানের পার্শ্বদেশস্থ বনানী হইতে জলদগম্ভীর স্বর শ্রবণ করিয়া প্রমাদ গণিল। উপদেবতার ভয়ে তখন তাহারা বিলক্ষণ ভীত হইয়াছে। তাহারা অগ্র-পশ্চাতে না চাহিয়া যে যেদিকে পাইল, সে সেইদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পলাইতে পারিল না কেবল তাহাদের নেতা। ভয়ে তখন সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে! ভয়াধিক্য বশতঃ বন্দীর ঘাড়ের উপর সে পড়িয়া গেল। তখন চিতা বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে বনান্তরাল হইতে জটাজূটমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী বহির্গত হইলেন। তিনি অন্য কেহ নহেন—বিমলানন্দ ভারতী।

বিমলানন্দ প্রজ্জলিত চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটী মনুষ্য বন্ধনাবস্থায় পড়িয়া আছে, আর একজন তাহার পৃষ্ঠে দেহভার রক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। ভারতী ক্ষিপ্র গতিতে একজনকে সরাইয়া দিলেন এবং আর এক জনের বন্ধন মোচন করিলেন। বন্দী রমেন্দ্র-

কিশোরের মুখ বস্ত্রাবদ্ধ ছিল? তাহাও অপসারিত হইল। ভারতী তখন দেখিলেন, সে ব্যক্তি অপর কেহ নহে—রমেন্দ্রকিশোর। রমেন্দ্রকিশোরও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিল, তাহার এ যাত্রারও রক্ষাকর্ত্তা—সেই মহাপুরুষ।

রমেন্দ্রকিশোরের তখন অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। দস্যুহস্তে সহসা বন্দী হইয়াই সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। মনোরমার চিন্তাতেও সে নিতান্ত অল্প ব্যাকুল হয় নাই। অবশেষে যখন তাহাকে চিতার উপর স্থাপিত করা হইল, তখন তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। আবার যখন মহাপুরুষের কৃপায় সে বিপদ্‌মুক্ত হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক হর্ষে এবং বিষাদে রমেন্দ্রকিশোর কথঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবসন্ন এবং বিস্ময়াপন্ন রমেন্দ্রকিশোর মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে কেবল মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল কোনও কথা কহিতে পারিল না। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বিমলানন্দের আর বিলম্ব ঘটিল না। রমেন্দ্রকিশোর বিমলানন্দকে ইঙ্গিতে একটা প্রশ্নও করিয়াছিল। বিমলানন্দ তৃতীয় ব্যক্তিকে সে প্রশ্নের উত্তর করিতে বলিলেন। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বিমলানন্দের সে কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিল না। তাহার দুই কারণ—প্রথম ভয়, দ্বিতীয়

বিস্ময়৭ ভয়ে ও বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু নির্ব্বাক্ হইয়াও সে রক্ষা পাইল না। বিমলানন্দ যখন বুঝিলেন, —সে সহজে উত্তর প্রদান করিবে না, তখন তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলাগ্রভাগ তাহার বুকের উপর রাখিয়া কহিলেন—

"এইবার বল্‌বে বোধ হয়।"

"ব—ব—ব—বল্‌ব।"

"বল।"

বিমলানন্দ সেই ভাবেই ত্রিশূল ধরিয়া রহিলেন—দুর্ব্বৃত্তের মুখে তখন সকল কথাই ব্যক্ত হইল। তাহাতে প্রকাশ পাইল, সে মধুসূদন ঘোষের কৃতী পুত্র বিশ্বনাথ। তাহার পিতার কথায় এবং অহিশেখর মিত্রের পরামর্শে রমেন্দ্রকিশোরের সন্ধানে সে এতটা পথ আসিয়াছিল এবং সন্ধান পাইয়া লোকজন সংগ্রহ করিয়া সে এই দস্যুতা সাধন করিয়াছে। রমেন্দ্রকিশোরকে যে সে আর পৃথিবীর বায়ু সেবন করিতে দিবে না, এইরূপই তাহার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

বিশ্বনাথ কিছু তোত্‌লা। "তো—তো" করিয়া অনেক অনাবশ্যকীয় কথার ভণিতা করিয়া অবশেষে সে বৈষ্ণব বাবাজীর কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে সকল কথা শ্রবণানন্তর রমেন্দ্রকিশোর শিহরিত হইয়া উঠিল। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বিমলানন্দ শ্মশানভূমি ত্যাগ করিয়া কল্যাণপুর গ্রামাভিমুখে দ্রুতপদে চলিলেন। রমেন্দ্রকিশোর তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।

বিশ্বনাথকেও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে হইয়াছিল—সেটা অবশ্য ত্রিশূলের ভয়ে।

বিমলানন্দ মহাশ্মশানে আসিয়াছিলেন—মহাকালীর অর্চ্চনায়, ইষ্টমন্ত্র সাধনায়। তাহাতে ইষ্ট হইল, শিষ্ট সেবক রমেন্দ্র-কিশোরের। গুরুর দয়া থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

প্রভাতালোক তখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুনীল চন্দ্রাতপতলে সে অপূর্ব্বালোক স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। শূন্য রাজ্য তখন গৌরব মহিমা-মণ্ডিত—নানা জাতীয় পক্ষিকুলের বৈতালিক গীতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। দুঃখ শোক জ্বালা, যন্ত্রণা ব্যথা, বেদনা সে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দূরে অপসারিত হইবারই কথা। তবে যাহাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, ভাগ্যদেবী তাহাদের প্রতি নিতান্তই অপ্রসন্না।

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, হইলও না। তরুণ তপনকিরণসম্পাতে জলস্থল ব্যোম্ আবার সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসিয়া গেল। আবার নূতন সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৃষ্টি হইল, আবার অভিনবের অভিনবত্বে প্রকৃতি অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল, আবার ভাবরাজ্যে নূতন ঘোষণা ঘোষিত হইল। প্রকৃতি দেবীর ইহাই লীলা, প্রকৃতি সাধকের ইহাই দর্শনীয়, ইহাই চিন্তনীয় আর বুঝিবা ইহাই স্পৃহার সামগ্রী।

সেই মধুর প্রভাতে কিশোরীদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণে কিন্তু বিষাদের ছায়া অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই উজ্জ্বল প্রভাতে, সেই পবিত্রতার মধ্যস্থলে, বিষাদকালিমা, অপবিত্রতার প্রেতমূর্ত্তি তখনও দূরীভূত হয় নাই। তবে কি বলিতে হইবে, প্রকৃতিরাণীর মোহিনী শক্তির পরাজয় হইয়াছে

এইস্থানে? অথবা ইহাও বুঝি প্রকৃতির আর এক প্রকার প্রকৃতি! কে জানে—ইহা কি, ইহা কেমন, কেনই বা এরূপ হইয়া থাকে।

কিশোরীদাস বন্ধনাবস্থায় তাহার সঙ্কীর্ণ অঙ্গনের একপার্শ্বে পড়িয়া আছে, আর মনোরমা আলুলায়িত-কুন্তলা হইয়া তাহাদেরই অনতিদূরে বসিয়া আছে। সুন্দরী মনোরমার মূর্ত্তি তখন অপূর্ব্ব। তাহার বসিবার ভঙ্গীও অপূর্ব্ব।

মনোরমার উপর পূর্ব্বরাত্রে যে উপদ্রব হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। নবীনানন্দ সে সময়ে দৈবানুগ্রহে না আসিলে তাহার ভাগ্যে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিত হইতে হয়। যাহা হউক ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার রমণীসুলভ মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও মনোরমার অভিমান টুটে নাই।

মনোরমা প্রথমে অনেক কাঁদিল, অনেক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল! কিন্তু রমণীর অভিমান তাহাতেও ধুইয়া মুছিয়া যাইল না। মনোরমা অবিবাহিতা হইলেও বয়স্থা; এরূপক্ষেত্রে রমণীসুলভ অভিমান, আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া থামিল বটে; কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের প্রত্যাগমনের আশা সে পরিত্যাগ করিল, পিতামাতার ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশা তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইল। তখন

সে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। দুষ্টের কবলিত হইয়া তাহার যে ইহকাল ও পরকাল মাটী হইতে বসিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহা বুঝিতে পারিয়াই সে শিহরিতা হইল। তখন সে আর কোনও মানা মানিল না, তখন তাহার আর কোনও আশা রহিল না। সে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল,—অবশেষে উপায়ও নির্দ্ধারণ করিল।

কুটীরের অনতিদূরেই একটা পঙ্কিল পুষ্করিণী ছিল। জলমগ্না হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার জন্য মনোরমা প্রয়াস পাইল। কিন্তু যে নবীনানন্দ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, সেই নবীনানন্দের যত্ন ও চেষ্টায় মনোরমার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। নবীনানন্দ সমস্ত রজনী জাগিয়া সে কুটিরে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল। মনোরমা তখন উন্মাদিনী,—মনোরমা তখন জীবনে স্পৃহাশূন্যা।

কিশোরীদাস, নবীনানন্দের হস্তে পড়িয়া বন্দী হইয়াছে। প্রথমে সে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে অপরূপ জীবটির বিচারভার মহাপুরুষের উপর কল্পনায় ন্যস্ত করিয়া নবীনানন্দ অপরাধীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কিশোরীদাস তখন কতকটা অনুতপ্ত; সে ভাবিতে লাগিল, এমন প্রলয়কাণ্ডে কেন সে লিপ্ত হইতে গিয়াছিল। সে হতভাগ্য, যাহাকে প্রণয়িনী ভাবিয়া প্রণয়-

সিন্ধুতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, সে ত প্রণয়ের ধারও ধারিল না। পরন্তু সে সিংহিনী-স্বভাবা। তাহার পর সে যাহার হস্তে বন্দী হইয়াছে, সেও যে বিশেষ কোমল প্রকৃতির লোক, সে কথাও সে মনে করিতে পারিল না। কিশোরীদাস পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—কতকটা প্রণয়ের ঝোঁকে পড়িয়া আর কতকটা অর্থলোভে পড়িয়া সে একটা ভারী অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে অনুতাপ তাহার ক্ষণকালের জন্য। সুতরাং সে অনুতাপে তাহার কোনও লাভ হইল না।

প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নবীনানন্দ মনোরমাকে কহিল—

"আপনি স্থির হন। পাপিষ্ঠ ত আপনার উপর অত্যাচার কর্‌বার অবসর পায় নাই। আপনি কেন নিরর্থক কষ্ট পাচ্ছেন, কেন আত্মঘাতী হ'বার চেষ্টা কর্‌ছেন? আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই। আমার কথা আপনি শুনুন, ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন। আপনাকে অনেক বুঝিয়েছি। সমস্ত রাত্ আপনি আমার ব্যক্তব্য শুনেছেন। একটু স্থির হ'ন। গুরুদেব এসে আপনার কল্যাণের পথ বলে দেবেন।"

কিন্তু সে কথা তখন শুনেই বা কে আর বুঝেই বা কে? তবে বারংবার সে কথা শুনিতে শুনিতে মনোরমা কথঞ্চিৎ শান্ত-ভাব ধারণ করিল। মহাপুরুষের আগমন সংবাদ শ্রবণানন্তর সে

কতকটা আশ্বস্তা হইয়াছিল। সে তখন ভাবিতে লাগিল—মহাপুরুষ সকলই করিতে পারেন। মনোরমা দীনা—দীনার উপায়ই বা কেন না হইবে।

উন্মাদিনীর শান্তভাব অবলোকন করিয়া উপদেশ-কর্ত্তার হৃদয়ে একটা অব্যক্ত আনন্দবেগ আসিল। আনন্দবেগে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে লাগিল—

মা যে আমার মায়ের মত
তুলনা কি মায়ের আছে।
যখন যেথায় থাকি আমি
মা থাকে গো পাছে পাছে।

হাসি কাঁদি মাকে নিয়ে,
আমার যে ভার মাকে দিয়ে
মায়ের কোলে মাকে ভেবে
ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার গেছে।

সার করেছি মায়ের চরণ,
মা যে আমার পরম কারণ,
আর ডেক না, আর ব'লনা
আছি আমি মায়ের কাছে

তা'র বল গো ভাবনা কিসের
মায়ের মত মা যা'র আছে।

গীত গাহিতে গাহিতে গায়কও তন্ময় হইয়া পড়িল, আর মনোরমাও সে গান শুনিয়া ভাবাবিষ্টা হইল। ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, শোক মনোরমার তখন আর কিছুই নাই। মনের স্বচ্ছন্দতা আসে নাই, কেবল কিশোরী দাসের। সে পাপী। প্রভাতে ভৈরবী রাগিণী তাহাকে কোনও সুখ, কোনও শান্তি দিতে পারিল না। পাপ চিন্তানলে তখনও সে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিমলানন্দ, রমেন্দ্রকিশোর ও বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে সংবাদ নবীনানন্দ কিম্বা মনোরমা প্রভৃতি আদৌ রাখিতে পারে নাই। বিমলানন্দও সে সংবাদদানে বিরত হইলেন। সিদ্ধকণ্ঠ নবীনানন্দ যে গীত গাহিতেছিল, সাধকচূড়ামণি বিমলানন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গীত থামিয়া গেল। তখন বিমলানন্দ ধীর-পাদবিক্ষেপে কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রমেন্দ্রকিশোর ও বিশ্বনাথও প্রবেশ করিল।

গায়ককে দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বিমলানন্দ তাহাকে স্থির হইতে বলিলেন।

মহাপুরুষকে দেখিয়া কিশোরীদাস থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিমলানন্দের মুখ তখন বড় গম্ভীর। মনোরমার ভাবাবেশ তখনও ভঙ্গ হয় নাই। গীত শব্দে তাহার এইরূপ

অবস্থা ঘটিয়াছে। বিমলানন্দ প্রথমে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেন। রমেন্দ্রকিশোর একদৃষ্টিতে গায়কের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। সে তখন নির্ব্বাক্; গায়কও আনতবদন—তাহার মুখেও তখন আর কোনও কথাই নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত ও মনোহর দাস যখন রমেন্দ্রের উদ্দেশে কল্যাণপুর যাত্রা করে, তখন মধুসূদন ও অহিশেখর রমেন্দ্রকিশোরেরই বাটীতে বসিয়া রমেন্দ্রকিশোরের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতে-ছিল। সত্যব্রতের কল্যাণপুর যাত্রার কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই বিশেষ চিন্তান্বিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, বিশ্বনাথ যদি বিশেষ সুবিধা না করিতে পারে, তাহা হইলেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে।

সেই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক গুপ্ত পরামর্শ চলিল। কিন্তু পরামর্শ করিয়া কেহই কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। তখন মধুসূদন অহিশেখরকে কহিল—

"তুমিই যাওনা না হয়। দেখই না ব্যাপার কি দাঁড়ায়!"

অহিশেখর তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত হইতে হুক্কাটী বামহস্তে লইয়া একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—

"তোমার যাওয়াই ভাল হে। পিতাপুত্রে পরামর্শ ক'রে তবু যা' হয় একটা কিছু ক'রুতে পারবে। তোমাদেরই ত কাজ হে। আমার কি বল ?"

সে কথায় মধুসূদন দারুণ বিরক্ত হইল। সে বিরক্তির সহিত বলিল—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"কি রকম, আমাদের কাজ কি রকম ? কেন তুমি কি টাকা কিছু অল্প পেয়েছ ?"

অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় অহিশেখর বলিল—"টাকা! কিসের টাকা! পরের টাকায় আমি দিব হাত! পরের জিনিষে আমি ক'রব লোভ! রাম, রাম, রাম,—তুমি ব'লুলে কিহে! পরের সম্পত্তি গ্রহণ ক'র্‌লে তুমি, আমি নিলেম টাকা! কি বল্‌ছ হে মধুসূদন! টাকার গদীতে ব'সে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি ?

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোক যেমন চমকিত হয়, অহিশেখরের কথায় মধুসূদনও সেইরূপ চমকিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বিশুষ্কমুখে কহিল—

"মিত্রজ, তুমি বোধ হয় রঙ্গ কর্‌ছ—কিন্তু একি রঙ্গের সময় ভাই ? তুমি কি বুঝ্‌ছ না বিপদ তোমারও যেমন, আমারও তেম্‌নি। কি হাস্‌ছ যে ?"

"হাস্‌ছি—তোমার কথা শুনে। আমার আবার বিপদ কিসের ? রমেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তি আমিত কিছুই গ্রহণ করি নাই। সে করেছ তুমি। বিপদ হয়, তোমারই হ'বে। আমার কি বল ? টাকা দেয়ই বা কে, আর নেয়ই বা কে ? রাম বল, রাম বল, তুমি অবাক্ ক'রে দিলে ভাই ?"

"তুমি বল্‌ছ কি মিত্রজ ?"

"ঠিক্ বল্‌ছি—চ'ক্ষু মুদে বল্‌ছি, চ'খ চেয়ে বল্‌ছি—বিষয়

গ্রহণ করেছ তুমি, আর বিপদে পড়্‌বেও তুমি। আমি আমার হক্‌ পাওনা নিয়েছি মাত্র। আমার ভ্রাতৃজায়ার দ্রব্যাদি আমি দাবী করেছিলাম। ভয়েই হ'ক্‌ আর নির্ভয়েই হ'ক্‌ তুমি সেগুলা আমায় প্রত্যর্পণ করেছ বটে। সেটা তোমার দয়া কিংবা ভয় তা তুমিই জান ভাই। যা' হ'ক্‌, আমি আমার পাওনা নিয়েছি। তা' মিথ্যা বল্‌ব না। এমন অধর্ম্ম আমি করি না। পাওনা আমার কড়ায় গণ্ডায় মিলিয়ে পেয়েছি। তা'র বেশী যদি কিছু দিয়ে থাক ভাই, সেটা আমার পারিশ্রমিক—কি বল!"

পরস্বাপহরণকারী মধুসূদন তখন এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সে বিজড়িতস্বরে কহিল,—"পারিশ্রমিক!—পারিশ্রমিক—কিসের? তুমিত রীতিমত বিষয়ের বখ্‌রা নিয়েছ।"

"না বন্ধু তা' নয়। তুমি বল্‌ছিলে রমেন্দ্রকিশোর স্বেচ্ছায় তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে গেছে—তুমি বিষয় দখল কর্‌তে পার্‌ছ না। তাই তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে। সে সম্বন্ধে আমি তোমায় পরামর্শ দিয়েছি ও যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। অ্যাঁ;—কি বল হে ভাই, সেটা আর অমান্য কর্‌তে পার্‌বে না। সেইজন্য আমার এই পারিশ্রমিকের দাবী। আমি যদি জান্‌তেম, তুমি ঠক্‌, প্রবঞ্চক, রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়ে তোমার কোনও অধিকার নাই, কিছুতেই আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তেম না। এখন দেখ্‌ছি, রমেন্দ্র জীবিত—তুমি প্রতারক। অতএব এখন থেকেই তোমাতে আমাতে

সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। তোমার কোনও কথাতে আর আমি থাক্‌ব না।"

অহিশেখরের কথা শুনিয়া মধুসূদনের চক্ষু অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অহিশেখর বুঝিল, মধুসূদন তখন ব্যাঘ্রবৎ হিংসা-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহার পক্ষে সমস্ত অকার্য্য কুকার্য্য সম্ভবপর। কালবিলম্ব না করিয়া অহিশেখর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ প্রদান করিয়া মধুসূদন অহিশেখরকে ধরিতে ছুটিল। অহিশেখর তখন প্রাণ-ভয়ে পলায়মান হইয়া দ্রুতগতিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া সোপান শ্রেণীতে নামিতেছে। মধুসূদন তখন উন্মত্তবৎ। সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া নামিবারও তাহার ধৈর্য্য ও অবকাশ রহিল না। লম্ফপ্রদানে সে অহিশেখরকে ধরিতে গেল। তাহার ফলে বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীত প্রায় মধুসূদন দ্বিতল হইতে নিম্নতলে পতিত হইল। আঘাতটা সাঙ্ঘাতিকই হইয়াছিল। বাটীতে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। ততক্ষণে অহিশেখর আপন বাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

অহিশেখরের ভাগ্যও মন্দ ছিল। বিধাতার বিধান তাহার প্রতিও কঠোর হইল। তাড়াতাড়ি অঙ্গণ পার হইতে যাইয়া অহিশেখর লক্ষ্য করে নাই যে দ্বারের পার্শ্বেই "মাছকাটা" একখানা বড় "বঁটি" পড়িয়া আছে। অসাবধানতা বশতঃ পদস্খলিত হইয়া বঁটিখানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহাতে

অঙ্গণে রক্তস্রোত বহিল। অহিশেখরের ' রক্তাক্ত কলেবর। তাহার উদর ভাগ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারের কথা—রোগীর জীবনের আশা অতি অল্প।

সত্যব্রত প্রভৃতি তখন তারকেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। সেখানে পৌঁছাইতে তাহাদের রাত্রি হইয়াছিল। সুতরাং সেদিন আর তাহাদের কল্যাণপুর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। স্থানীয় লোকেরা কহিল—রাত্রিকালে সে পথে চলা বিপজ্জনক। সুতরাং বাধ্য হইয়া সে রাত্রি তাহাদের সেইস্থানে কাটাইতে হইল। পরদিন প্রভাতে একজন স্থানীয় লোককে সঙ্গে লইয়া তাহারা গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল। যানবাহন কিছুই পাওয়া যায় না। যানাদি ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য সত্যব্রত একজন লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গেল।

তাহারা পদব্রজেই চলিল। পদব্রজে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল, পথিপার্শ্বস্থ পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরগুলি ভীষণ জলপ্লাবনের ভীষণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। প্রান্তর ক্ষেত্রেও সে স্মৃতি জাগিয়া আছে বটে—কিন্তু স্থানে স্থানে নবীন শ্যামল শস্যগুচ্ছ কতকটা সান্তনার স্থল হইয়াছে।

কল্যাণপুরে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যকর খরতর হইয়া উঠিয়াছে। কিশোরীদাসের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের আর বাঙ্‌ নিষ্পত্তি হইল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যব্রত কুটীরাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিল, তাহাতে সে কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তৎপরে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া যাইয়া সে রমেন্দ্রকিশোরকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের তখন কি আনন্দ! আনন্দবেগে কাহারও মুখে কোনও কথা নিঃসৃত হইল না—আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পর নীরবে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বিমলানন্দ ভারতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—কে বলে সংসার নিষ্ঠুর, সংসার মরুভূমি! যে সংসারে এমন বন্ধুপ্রীতি, এমন মানবতা, সে সংসার কি নিরানন্দ হইতে পারে?

মনোহর দাসের নয়নে তখন আনন্দাশ্রু বহিতেছিল। সে রমেন্দ্রকিশোরকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। হারানিধির দর্শন পাইয়া সে যে কি আনন্দসাগরে ভাসিতেছিল, তাহা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে? তখন মনোহর দাসের চক্ষেও অশ্রুধারা আর রমেন্দ্রকিশোরের চক্ষেও অশ্রুধারা। ধারা নাই কেবল সত্যব্রতের চক্ষে। নয়ন বিস্তার করিয়া কুটীরমধ্যে সে কি একটা অলৌকিক পদার্থ দেখিতেছিল।

বিমলানন্দের পবিত্রস্পর্শে এবং সাতিশয় যত্নে মনোরমার জ্ঞান হইয়াছিল বটে,—কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরকে দেখিয়া সে কি যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু রমণীর ধৈর্য্য ও মানসিক বল

অমানুষিক। সেই শক্তিবলে সে আপনাকে কতকটা সংযত রাখিতে পারিল। তবে রমেন্দ্রকিশোরের সম্মুখে সে আর থাকিতে পারিল না—কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মানসিক উত্তেজনা তাহার যথেষ্টই হইয়াছিল। তাহারই ফলে কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিমলানন্দ ভারতী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি নবীনা-নন্দকে তাহার সেবার জন্য গৃহমধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গুরুর আদেশে শিষ্য তখন মনোরমাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

সত্যব্রত সেই দৃশ্যই একাগ্রচিত্তে দেখিতেছিল। তাহার লক্ষ্য মনোরমা নহে—নবীনানন্দই তাহার লক্ষ্যস্থল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সত্যব্রত আপনাকে রমেন্দ্রকিশোরের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিল। তাহার পর বিমলানন্দ ভারতী ও অন্যান্য সকলের মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। অবশেষে সে ছুটিয়া যাইয়া নবীনানন্দকে আপন বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"পাঁচু, পাঁচু, আমার পাঁচু!"

সত্যব্রতের আর সংজ্ঞা নাই। সংজ্ঞাহীন হইয়া সে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তখন সত্যব্রতের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই অবসরে কিশোরীদাস ও বিশ্বনাথ নিঃশব্দে সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

সত্যব্রতের জ্ঞান হইলে, সে দেখিল পাঁচুগোপাল তাহার

মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে, আর রমেন্দ্রকিশোর ও মনোহর দাস তাহাকে ব্যজন করিতেছে, বিমলানন্দ ভারতী তখন বড় গম্ভীর—গুরুর সে গাম্ভীর্য্য দেখিয়া শিষ্যকেও অগত্যা গম্ভীর হইতে হইল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সত্যব্রত উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। বিমলানন্দ ভারতী তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন।

এইবার বিশ্বনাথ ও কিশোরীদাসের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু তখন তাহারা কোথায়! বিমলানন্দ হাসিয়া বলিলেন—

"মাকড় আপন জালেই আপনি জড়ায়। ভগবানের কি কারখানা!"

সেই সময় রমেন্দ্রকিশোর আসিয়া বিমলানন্দ ভারতীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ভারতী হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি অন্যের চক্ষে অর্থশূন্য বটে; কিন্তু সে হাসির মধ্যে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

রমেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু বাহিরে এলেন যে?"

বিমলানন্দ হাসিয়াই কহিলেন—"রোগে। যা'হক্ ও রোগীর এখন খবর কি?"

"ভাল।"

"রক্ষা হ'ল। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই জীবনসংশয় হয়। সেই জন্যই একটু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছিলাম।"

রমেন্দ্রকিশোর তখন ভারতীকে পাঁচুর "পুনর্জ্জন্মের" কথা

জিজ্ঞাসা করিল। তিনি সে কথার বিশেষ কোনও উত্তর দিলেন না বা দিতে চাহিলেন না। বিমলানন্দ ভারতী কেবলমাত্র কহিলেন—"সে সকল কথার এখন সময় নয়। হারাধন ফিরে পেয়েছে, সেই ভাল। অত কথার আবশ্যক কি? এই যে তুমি কাল রাত্রে আমায় শশ্মানে দেখ্‌লে, তা'তে তোমার কি উপকার হ'ল না হ'ল সে কথা জিজ্ঞাসা করেছ কি? আমার কাজ হ'ল ঘোরা, দিন্‌ রাত্‌ ঘোরা—বিশ্রাম নাই—অবিশ্রাম ঘোরা; তা'তে কা'রও হয়ত কোনও কাজ হয়ে গেল, কারও হয়ত হ'ল না—তা'তে এল গেল কি? মা আমার যা' করেন, তা' জীবের মঙ্গলের জন্য। অত বাজে কথায় কাজ কি বাপু?"

রমেন্দ্রকিশোর অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। বিমলানন্দ তাহার অপ্রতিভভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে একটু দয়া করিলেন। পাঁচুগোপালের সম্বন্ধে তিনি কহিলেন—

"বালক অভিমানভরে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'র্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু তা'তে সে কৃতকার্য্য হয় নি। অচৈতন্য অবস্থায় সে ভেসে যাচ্ছিল, কালীঘাটের গঙ্গার মুখে আমি তা'কে পেয়েছিলাম। সেই অবধি সে আমার নিকটেই আছে। এখন, তোমাদের জিনিষ তোমরা ফিরে নিয়ে যাও। কিন্তু এত কথা তোমার বন্ধুকে ব'ল না। কা'র উপরে অভিমান, কিসের অভিমান—সে প্রসঙ্গ উঠ্‌লে আবার একটা আগুণ জ্বলে উঠ্‌বে।

সংসারকে আমি বেশ চিনেছি। তাই ত সংসারে থেকেও থাকি না।"

কথা বলিতে বলিতে বিমলানন্দ ভারতী আবার কুটীরাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রমেন্দ্রকিশোরও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। সত্যব্রত তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। সে পাঁচুগোপাল ও মনোহরদাসের সহিত তখন বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মনোরমা একপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সে তখন ভাবিতেছিল, দুই দশ ঘণ্টার ভিতর কত কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল।

সত্যব্রত অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঁচু গোপালের নিকট হইতে তাহার সম্বন্ধে কোনও তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারিল না। সকল কথাতেই পাঁচুগোপাল কহিল—"সে সকল কথা মহাপুরুষ জানেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা।"

রমেন্দ্রকিশোর মধ্যস্থ হইয়া সে সকল কথার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল এবং আহারাদি করিয়া সেই দিবসের অপরাহ্ণেই যে যাত্রা করিতে হইবে, সে কথা শুনাইয়া দিল। কল্যাণপুর আর তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না।

শিবিকা প্রভৃতি ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছিল। আহারাদির পর সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। পাঁচুগোপাল তখন বিমলানন্দ ভারতীর চরণ ধারণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিল—"দয়াময়, আবার কবে দেখা পা'ব?"

বিমলানন্দ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"দেখা চাইলেই দেখা পাবে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও। কর্ত্তব্যপালন কর, অভিমানবশে আর আত্মহারা হয়ো না।"

অভিমানের কথা, আত্মহারা হওয়ার কথা শুনিয়া সত্যব্রত একটু চমকিত হইল। বিমলানন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অন্য পাঁচ কথায় সে কথা চাপা দিয়া যাত্রাটা যাহাতে শীঘ্র হয়, তাহাই করিতে বলিলেন।

রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত তখন ভারতীকে ধরিয়া বসিল, —তাঁহাকেও তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। বিমলানন্দ কহিলেন—"যা'ব বৈ কি—কিন্তু পরে। এখনও এখানকার কাজ অনেক বাকী। জীবসেবাই আমার ধর্ম্ম ও সেবাই আমার কর্ম্ম। সেবাকার্য্যেই আপাততঃ এখানে আমার অবস্থিতি।"

সে কথার পর আর কেহ সে সম্বন্ধে কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না। বিমলানন্দের আদেশে সকলে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিল। ধীরপাদবিক্ষেপে ভারতী প্রান্তরপথে মহাশ্মশানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সমাপ্ত।

পরিশি

বিশ্বনাথ ও কিশোরীদাস পলাইয়া আসিয়া গ্রামান্তরে জনৈক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিল। তাহাদের অভিপ্রায় দুইএক দিন সেইস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া পরে তাহারা অভীষ্টস্থানে গমন করিবে। অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ অতিথিদ্বয়কে নিঃসঙ্কোচে সে গৃহে স্থান দিল। অতিথিদ্বয় কিন্তু গৃহস্থের ঋণ পরিশোধের উপায় স্থির করিল চমৎকার।

গৃহস্থের একটী যুবতী কন্যা ছিল। কিশোরীদাস তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া একটু রঙ্গ করিল। বিশ্বনাথও সে রংতামাসায় যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। পিতৃসমক্ষে ও ভ্রাতৃ-গণের নিকটে কন্যা সকল কথা জ্ঞাপন করিলে, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হইল অন্যরূপ। সে ব্যবস্থায় বিশ্বনাথের একটি চক্ষু বিষম আঘাত পাইল এবং কিশোরীদাসের বাম কর্ণখানা খসিয়া পড়িল! তাহাতেও তাহারা নিস্তার পায় নাই। মাথা মুড়াইয়া তাহাদের মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ যখন তাহার পিতৃসমীপে উপস্থিত হইল,তখন তাহার একটী চক্ষু গিয়াছে। তাহার পিতা মধুসূদনও তখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অহিশেখর মিত্রও যে তাহার পিতার ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রমেন্দ্রকিশোরের দয়ার অন্নে জীবনযাপন

করিতেছে, সে কথা শুনিতেও বিশ্বনাথের বাকী রহিল না। বিশ্বনাথ তখন পিতার প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। পুত্র কহিল, "পিতা সজ্জন হইলে তাহাদের আর তেমন দুর্দ্দশা ঘটিত না।"

* * * *

কিশোরীদাস ভিক্ষুক বৈষ্ণব। দেশান্তরে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া সে জীবনাতিপাত করিতে লাগিল। তবে সাধ্যপক্ষে সে আর পরদারের প্রতি কুটীল দৃষ্টিপাত করে না। তাহার একটা কর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার নাম হইল কাণ কাটা বৈষ্ণব। সেই নামেই সে পরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

* * * *

পাঁচুগোপাল গৃহে ফিরিল; সকলের আদরেও রহিল বটে, কিন্তু গৃহ আর তাহার ভাল লাগিল না। সুযোগ পাইলেই সে কালীঘাটে তাহার গুরুদেব বিমলানন্দের নিকট চলিয়া যাইত এবং আবশ্যকানুসারে পরিচিত ও অপরিচিতের "ব্যাগার" দিত।" তাহার মাতুলানী সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, তাহার মাতুল সত্যব্রত বলিত—"চুপ্ রহো মাগী, উন্‌কা যৌন্ খোসি, ভৌন্ করেঙ্গা। জাননা, তোমাদের বুদ্ধির দোষে ওকে একবার হারিয়েছিলাম। আমি সব শুনেছি, সব জানি। তোমরা চুপ্ ক'রে থাক। না থাক ত আমি আবার রেগে হিন্দি কথা বল্‌ব—হঁা। অনেক সাধ্য-সাধনায় আমার হারাধন

ফিরে পেয়েছি। ওর যা খুসী ও তাই কর্‌বে। কেউ কথা কয়োনা—হঁ্যা।”

কাজে কাজেই সে কথায় আর কেহ কথা কহিতে সাহস করিল না! পাঁচুগোপাল বিমলানন্দের নিকট প্রায়ই যাইয়া থাকে এবং বিমলানন্দ ভারতীও মধ্যে মধ্যে সত্যব্রতের বাটীতে আসিয়া সকলের সংবাদ লইয়া থাকেন। তাহাতে সত্যব্রতের কৃতজ্ঞতার আর সীমা নাই।

মনোরমার মাতা সাবিত্রীসুন্দরী,—বিমলানন্দ ভারতীর চিকিৎসাগুণে আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু ভীষণ জলপ্লাবনে তাহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে দুঃখের স্মৃতি তাহার হৃদয় হইতে আর কিছুতেই মুছিল না। তবে মনোরমাকে ফিরিয়া পাইয়া শোকসন্তপ্তা জননী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার শোকের প্রাবল্য হইত। হরকুমার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা অনেক সময়ে বিফল হইত। শোকাতুরার শোক-গাথা হইয়াছিল—“রমা এল, কিন্তু খোকা এল না কেন?”

মনোরমা এখন রমেন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী। বাটী-প্রত্যাগমনের পর সত্যব্রত ও সত্যব্রতের পত্নীর ঘট্‌কালিতে শুভোদ্বাহ শুভদিনেই সম্পন্ন হইয়া গেল। রমেন্দ্রকিশোরের সুখের এখন আর সীমা নাই। মনোহরদাসের উপর সমস্ত বিষয় কার্য্যের

ভারার্পণ করিয়া সে এখন মনোরমার মনস্তুষ্টি সাধনেই যত্নবান্। সত্যব্রত সেইকথা লইয়া কত রঙ্গ বিদ্রূপ করে। কিন্তু রমেন্দ্র তাহাতেও অন্দরমহল ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় না। সত্যব্রত মনে মনে ভাবিল—"হায় পিসীমা, তুমি এখন কোথায় ?"

তিন চারি বৎসর এইরূপেই কাটিয়া গেল। একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ছাদে বসিয়া রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা উভয়ে মিলিয়া একটী শিশু-সন্তানকে আদর করিতেছিল। সেই সময়ে সত্যব্রত আসিয়া নিম্নতল হইতে ডাক্ দিল—"রমি, আছ ?"

উপরতল হইতে উত্তর আসিল—"বড় ব্যস্ত আছি হে, জলধি ছাড়্ছে না, তুমিই উপরে এস সতু।"

জলধি অর্থে খোকা—রমেন্দ্রকিশোরের পুত্র। খোকার নাম "জলধি" রাখার একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস সেই ভীষণ জলপ্লাবনের সহিত জড়িত।

সত্যব্রত ন্দ্রকিশোরের "জলধি" তাহাকে ছাড়ুক বা না ছাড়ুক্, রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে না। অগত্যা তাহাকে উপরেই উঠিতে হইল। সত্যব্রতের পদশব্দ শুনিয়া মনোরমা পলাইয়া যাইতেছিল। রমেন্দ্রকিশোর সোহাগে সোহাগিনীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল—"সতুর কাছে এখনও লজ্জা।"

সে কথা সত্যব্রত শুনিতে পাইয়াছিল। গম্ভীরভাবে সে

কহিল—"সেটা ন্যায় কি অন্যায় তা'র বিচারের ভার জলধির উপর দাও। জলধি বিচারক ভাল—সে নিশ্চয় এটার সুমীমাংসা করিয়া দিবে।"

জলধি বোধ হয় সে কথা বুঝিল। মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে তাহার মাতার ঘোম্‌টা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল এবং উচ্চহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহাতেও ঘোমটাবৃতার ঘোম্‌টা খুলিল না।

মনোরমা এ কালের অনেক সুন্দরীর মত লজ্জাটাকে "শিকায়" তুলিয়া রাখিতে পারে নাই। লজ্জাই রমণীর সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্যে সে বঞ্চিত ছিল না। বাঙ্গালীর মেয়ের ঘোম্‌টা সরিলে আর থাকে কি?

সত্যব্রত হাসিয়া কহিল—"ঠিক্ বিচার হয়েছে। জলধি না হ'লে এমন বিচার করে কে?"

জলধি মাতার কোল ছাড়িয়া পিতার কোলে আসিয়া বলিল—"বাব্-বা-হামি।"

পিতা সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিল এবং শশধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"সতু, মনে পড়ে কি সেই জলপ্লাবন?"

সত্যব্রত কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"পড়ে বই কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেন্দ্রকিশোর কহিল,—"সেই জলপ্লাবনেই আমাদের অনন্ত দুঃখ, আর সেই জলপ্লাবনেই আমাদের অনন্ত সুখ।"

উত্তেজিত ভাবে সত্যব্রত বলিল,—"নিশ্চয়! সেই জল-প্লাবনের ফলেই পাঁচুগোপালকে আমি ফিরে পেয়েছি, আর সেই জলপ্লাবনের ফলেই তুমি সংসারী হয়েছ।"

সে কথা শুনিয়া রমেন্দ্রকিশোরের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল—তাহার পিসীমাতার স্মৃতিতে; আর দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল সত্যব্রতের নয়নে—আনন্দাবেগে।

মনোরমা আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। সে দ্রুতপদে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত। জলপ্লাবনের কথায় তাহার মাতৃভূমির কথা, তাহার ভ্রাতার কথা, তাহাদের গৃহহীন হইবার কথা, তাহার মনে পড়িল—তাহার স্মৃতিসাগর আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল—বন্যার জলে না ভাসিলে সে ত আজ রমেন্দ্রকিশোরের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিত না।

চন্দ্রদেব মেঘের আড়ালে লুকাইত হইলেন। অন্ধকারের ছায়া দেখিয়া জলধি হস্তবিস্তার করিয়া কহিল,—"বাপি, মা দাব।"

সকলে তখন নীচে নামিয়া আসিল। পাঁচুগোপাল তখন গীত গাহিতেছে—

যবে মুক্ত গগনে শান্ত পবনে
চন্দ্রকিরণ বহিয়া যায়,
মম চিত্ত চকোর নৃত্য করে যে
নিত্য পীযুষ ভকিতে চায়।

যবে—গভীর গরজে জলদ বাহিনী,
শুনাইতে জীবে প্রলয় কাহিনী,
হুঙ্কারে বায়ু উথলে সিন্ধু
তুঙ্গ শৃঙ্গ খসিয়া যায় ;
চমকে চপলা বাঁধিয়া নয়ন,
দীপ্ত প্রখর দ্বাদশ তপন,
দগ্ধ ধরণী লুপ্ত সলিলে
তখনো আমি যে তোমারি ছা'য় ॥
তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ,
সত্য শুধু হে তোমারি চরণ,
কেন সে ভ্রান্তি, কিসের ক্লান্তি
কিসের জন্ম মৃত্যু হায়,
যুক্ত তোমাতে আমি হে মুক্ত
পড়িয়া আছি যে তোমারি পায় ॥"

গায়ক, মিশ্র-মল্লার সুরে গীতটী গাহিতেছিল। সে সুর, সে ভাষা—জলপ্লাবনের ছবি শ্রোতৃগণের কল্পনার চক্ষে প্রস্ফুট করিয়া দিল এবং অনন্ত জীবনে অনন্ত সুখের কথাও বিজ্ঞাপিত করিল। তখন সকলে বুঝিল, ভগবৎ পদে মতি থাকিলে, ভগবানের নামে রুচি থাকিলে, তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারিলে জলপ্লাবনেও যে আনন্দ, ক্ষপাকর ধারাতেও সেই আনন্দ। আনন্দ-গীতিতে তখন সকলে আনন্দময় হইয়া উঠিল।

সেই ভীষণ জলপ্লাবনের কথা তখন আর কাহারও মনে রহিল না। পাঁচুগোপালের সেই গীত তাহাদের কাণে দূরাগত বেণু-ধ্বনির ন্যায় বাজিতে লাগিল। কাণের ভিতর দিয়া তাহা তাহাদের মরমে পশিয়াছিল।